

সরব চিন্তন

সরব চিন্তন

(প্রবন্ধ সংগ্রহ)

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর

পারুল প্রকাশনী

১৬, আখাউড়া রোড
আগরতলা ৭৯৯ ০০১

১৮এ, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০০৯

SARAB CHINTAN : Prabandha Sangraha : A book of selected Bangla Essays.
Loud Thoughts : by Professor Prabhas Chandra Dhar. Essays biographical, devotional, patriotic, literary, linguistic, etc. published in dailies and journals during a period of three decades have been selectively taken for this volume.

প্রকাশক ঃ পারুল প্রকাশনী ঃ ১৬ আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯ ০০১
১৮ নরেন সেন স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ বিশ্বকর্মা পূজা ১৪০৬; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

অক্ষর সজ্জায় ঃ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট, ৬৩/২ডি সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর ঃ বসু মুদ্রণ, ১৯এ, শিকদার বাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীস্বপন নন্দী

উৎসর্গ

...... আমার প্রয়াতা
মাতৃদেবীর
চরণে।

ভূমিকা

একবার ঐ গাছে একটা পাখি এসে বসেছিল। আকাশ মাতিয়ে, বাতাসে ডুব সাঁতার দিয়ে সামান্য নীল পাখি তার ডানার মন্তব্য আর কাগজ কলম নিয়ে বসেছিল 'হ্যাঁ, আমি তার লেখাও পেয়েছি।'

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কদিন আগে নানা জায়গায় খুঁজে খুঁজে অবশেষে প্রভাসচন্দ্র ধর মহাশয় টুক করে এসে বসে পড়েছিলেন আমার পাশের চেয়ারে। তারপর আগরতলায় একদা প্রচলিত রাজবাড়ীর বাংলার ঢঙে প্রশ্ন করলেন—'এখন কি ব্যস্ততা খুব বেশী? আমার কয়েকটা প্রবন্ধ পড়ে দেখে দেওয়া যাবে?' আমি রাজী হয়ে যাই। প্রভাসবাবু তখন দ্বিতীয় পাখনাটি খোলেন—'একটা কিছু কিন্তু লিখেও দিতে হবে।' আমি না ভেবেই বলে ফেলেছিলাম—'ঠিক আছে।' আর এরই ফলে তার লেখা আমি পেয়েছি—তার আসন্ন-প্রকাশ প্রবন্ধের বই 'সরব চিন্তন'এর কপি।

এখন দেখছি প্রভাসবাবুর কথায় রাজী হয়ে ঠিক করিনি। প্রভাসবাবু ভারতবর্ষের বেশ কয়টি প্রাদেশিক ভাষা জানেন। তার বইয়ে এই সব ভাষার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে। ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান তার অন্যতম বিচরণক্ষেত্র। কিছু লেখা রয়েছে সেই বিষয়েও। সর্বোপরি ককবরক। প্রভাসবাবু ককবরকের প্রতিষ্ঠিত লেখকই শুধু নন, তিনি ককবরকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুবাদ করেছেন। এই সব বিষয়ে কোন কিছু বলার অধিকারই নেই আমার।

কিন্তু যব্ ওয়াদা কিয়া ... । অতএব মাভৈঃ। নির্ভয়তার আরো একটি কারণ অবশ্য আছে। বইটিতে ভারত দেশ, তার স্বাধীনতা-পরাধীনতা, তার অতীত-বর্তমান ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ আছে। আর এইসব বিষয়ে মতামত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকাব সবার মতই আমারও রয়েছে।

'সরব চিন্তন' বইটিতে সাঁইত্রিশটি প্রবন্ধ আছে। তার মধ্যে পাঁচটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে লেখকের চিন্তাভাবনার ফসল। কোথাও তিনি বলেছেন—"তাই স্বাধীনতা দিবসে প্রতিবছর আমি ১৯৪৭ সালে আবার ফিরে যাই। আমার তৎকালীন মনোভাবের সঙ্গে আজকের দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান দুবত্ব দেখে বিমর্ষ হই।" আবার কোথাও বলেছেন—"স্বাধীনতার জন্য কোটি কোটি মানুষ পথে নেমেছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না তখন ব্রিটিশ সরকারকে কায়েম রাখতে যারা শক্তি যোগাচ্ছিলেন তাদেরও পঁচানব্বই শতাংশই ছিলেন ভারতীয়।" অন্যত্র স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য—"স্বাধীনতা এখন চরম বিপদগ্রস্ত।

কিন্তু কার হাতে বিপদগ্রস্ত? ইংরেজকে চেনা সহজ ছিল। এখনকার শত্রু হয় আমি নয় আমার ভাই।" স্বাধীনতা প্রসঙ্গে লেখকের এই বক্তব্যগুলির সঙ্গে অনেকেই সহমত পোষণ করবেন। *কিন্তু ব্রিটিশ আমলের সব কর্মচারীকে এককথায় স্বাধীনতা* বিরোধী বললে খুব বেশী সাধারণীকরণ হয়ে যায় না? "বন্দেমাতরম্"-এর লেখকই তো ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। অন্যদিকে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীই যে স্বাধীনতার পর আর 'মানুষের স্বাধীনতার' পক্ষে থাকেন নি একথাও তো ঠিক।

'সরব চিন্তন' বইটির দ্বিতীয় আকর্ষণ বারোটি জীবনীচিত্র। যাদের জীবন নিয়ে লেখা তাঁরা সবাই বিখ্যাত মানুষ। ব্যতিক্রম শুধু সত্যবাবু। কিন্তু ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে লেখাটির অন্তর্ভুক্তি অযৌক্তিক নয়। বইটিতে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ আছে ছয়টি। "রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ" এবং "রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধ দুটি তথ্যসমৃদ্ধ। "ওড়িয়া কবিতা সাম্প্রতিককাল" এবং "সাম্প্রতিক মালয়ালম্ কবিতা" আমাদের প্রতিবেশী কাব্যের স্বাদ এনে দেয় দক্ষ ভাবেই।

কিন্তু বইটির সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধগুলি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে। ভাষাতত্ত্ব এক বহুমুখী বিদ্যাক্ষেত্র। এখানে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, চিত্রকলা ইত্যাদি বহু শাখা একত্রে কাজে লাগে। কাজ করে এমনকি গোয়েন্দাগিরিও। শব্দের লেজ ধরে ধরে ভাষাবিজ্ঞানী সুদূর ইতিহাসও খুঁজে বের করে আনেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখন নিবিড় গবেষণা চলছে পৃথিবী জুড়ে। বহুলোক এঁতে কাজ করছেন। নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে। অবশ্যই তাদের সব আবিষ্কারই শেষ ধোঁপে নাও টিকতে পারে। কখনো কখনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিথ্যা তত্ত্বও দাঁড় করানো হয়। বাংলাভাষাকে অহিন্দু ভাষা প্রমাণ করার তাগিদে এক পূর্বপাকিস্তানী ভাষাতাত্ত্বিকতো প্রমাণই করে ছেড়েছিলেন যে বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাই নয়। সংস্কৃত বা আর্য ঐতিহ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই। বাংলা আসলে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা।

বর্তমান বইটিতে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ রয়েছে—"ককবরকের লিপি", "ভাষা", ভাষাতত্ত্বের আঙিনায়" এবং "ভাষার বিবর্তন ঃ আগরতলার ভাষা। স্বীকার করতেই হবে ভাষাতত্ত্বের এই জটিল বিষয়গুলি প্রভাবসবাবু উপস্থাপিত করেছেন যথেষ্ট সহজ, সরল এবং সরসভাবে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে তার পৃথক বই লেখা হলে উপকারে আসবে। তবে ক্ষোভ এই যে একটি প্রবন্ধে তিনি ককবরকে সংখ্যাগুলির সঙ্গে উচ্চারিত শ্রেণীবিভাজকের কথা উল্লেখ করলেও এর ব্যাখ্যাটুকু অনুল্লেখিত রাখায় পাঠকেরা বঞ্চিত বোধ করবে।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও বইটিতে রয়েছে কিছু রম্যধর্মী এবং কিছু অন্যধর্মী প্রবন্ধ, যেমন "নারীর অধিকার", প্রসঙ্গ অভিধান", হিন্দুর ধর্ম ও মনুষ্যের ভবিষ্যৎ"

"ভুলে ভরা সংসার", বইমেলা বইমেলা" ইত্যাদি। এই সব প্রবন্ধ পড়তে অনেকেরই ভাল লাগবে।

প্রতিশ্রুতি পালনের দায়ে বইটি সম্পর্কে অনেক কথাই বলে ফেললাম একটু পণ্ডিতী করার ঢঙে। কিন্তু খুঁত না ধরতে পারলে পণ্ডিতী হয় না। প্রভাসবাবুর বইয়েও কিছু কিছু খুঁত অবশ্যই আছে। তিনি জন্মসূত্রে সব মানুষ সমান একথাটা পরিপূর্ণভাবে মানেন না। এবং তাছাড়া যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই আমাদের কষে গালমন্দ করেছেন, চোখে আঙুল দিয়ে খুঁত ধরেছেন। এতে আমরা একটু আধটু রাগ করতে পারি স্বাভাবিক ভাবেই।

সবশেষে, অনুরোধে, ঢেঁকি গিললেও, বলতে দ্বিধা নেই 'সরব চিন্তন' বইটা আমার ভাল লেগেছে।

মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়
আগরতলা

অধ্যাপক
মিহির দেব

লেখকের কথা

সর্বক্ষণই মনের মধ্যে চিন্তন চলছে। অহোরাত্র সেই চিন্তনের বিরাম নেই। জাগরণে আলাপনে, শয়নে, স্বপনে চিন্তন সতত চলমান। সেই চিন্তন স্রোত স্রোতস্বিনীর সমগোত্রের। আপাতদৃষ্টিতে স্রোতস্বিনী নিরবচ্ছিন্ন জলধারা, নিম্নগামী, অক্লান্ত। কিন্তু বস্তুত লক্ষ লক্ষ পরস্পর পৃথক জলবিন্দু নিজ নিজ স্বপ্নে বিভোর হয়ে দয়িত জলধির দিকে ধাবমান। চিন্তার স্রোতও এই রকম। অসংলগ্ন, পরস্পর সম্পর্কহীন চিন্তাবিন্দুগুলি উঠছে, ছুটছে; তাদের আবির্ভাবও অন্তর্ধান হচ্ছে কতবার, কে তার হিসাব রাখে? কোন ভাল কাজে মন নিবিষ্ট করতে চাইলে ঐ চিন্তারা আরো বেশি ভীড় করে। পরীক্ষার আগে পড়ার সময়, টেবিলে বসে সাহিত্য আরাধনা করার সময়, একাগ্র হয়ে জপ ধ্যান করার চেষ্টা করার কালে এদের উপদ্রব বাড়ে। বাসরঘরে বেড়ার পাড়ে চুপিসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতুককারী রসিকাদের মত। বড় জ্বালায়, বড় ঠকায়, পথ ছাড়িয়ে বিপথে নিয়ে যায় বারম্বার। ইংরেজীতে নাম আছে একটা গালভরা—স্ট্রীম অভ্ কন্‌শাস্‌নেস্। তবে কোনো কোনো সময় ব্যতিক্রমও ঘটে। মানুষের ভীড়ে হাঁটা যাচ্ছে না। পথে হুঙ্কারকারী বলীবর্দের আগমনে সে পথ জনশূন্য হয় ঝটিতি; দুর্মদ দাম্পত্যকলহ অকস্মাৎ রূপান্তরিত হয় স্মিতহাস্যে, জোড়কর লাস্যে, বন্ধু বা স্বজনের আগমনে; উদ্ধত জননেতা বিনম্র হয় নির্বাচনের নৈকট্যে। চিন্তনও কোন কোন সময় একাগ্র হয়। যৌবন উদ্গমে মনের মানুষটি পাওয়া গেলে, না বলে সকলের অলক্ষ্যে পরের জিনিসটি হস্তগত করার কালে, আত্মপ্রশংসার উচ্ছ্বাসে, পরচর্চার অধিবেশনে, চিন্তনের বাহুল্য থাকে না। মন একাগ্র হয়। সামান্য ছোটখাটো লেখার সময়ও চিন্তারা সাময়িক অব্যাহতি দেয়, বহু অগ্রতার বাহুল্যের সাময়িক বিলুপ্তি ঘটে। এখানে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলি চিন্তার সেই সাময়িক বহুতা নিলম্বনের জাতদ্রব্য।

আসলে এই সংসারে কখন কি ঘটে যায় তার ব্যাখ্যা চাওয়া অনেক সময়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয়; দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে অসম্ভবও অনেক সময় সম্ভব হয়ে যায়। রামচন্দ্র বনে চলে যান, কংসরাজা নিহত হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়, সোভিয়েত রাশিয়া বিলুপ্ত হয়, হত-দরিদ্র আরব অঞ্চল কল্পনাতীত ধনী হয়ে ওঠে, জুতা পালিশ করা কিশোর মহামন্ত্রী হয়, কত কি হয়! এত কিছু যখন হয়, তখন আমার মত মানুষের দ্বারাও কিছু লেখা হয়ে যাওয়ায় বিস্ময়ের কিছু নেই। এখানেও আপাত অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। এই সুযোগে নিজের কথা কিছু বলেই ফেলি। অন্যকে আমার সম্বন্ধে কিছু বানিয়ে বলার কষ্ট থেকে মুক্তি দিই। স্থানান্তরে এসব কথা ইংরেজীতে বলেছি। এখানে একটু বাংলায়ও বলি।

ছোট্ট এক গ্রাম ন্যামতপুর। নিকটবর্তী রেলস্টেশন কিশোরগঞ্জ (এখন বাংলাদেশ)

থেকে হাঁটাপথে বিশ কিলোমিটার দূরে। সেই গ্রামের সব শিক্ষিত বয়স্ক লোকেরা সর্বদাই বাড়িতে অনুপস্থিত থাকতেন। তাঁরা থাকতেন দূরে, তাঁদের কর্মস্থলে। বাড়িতে কখনো সখনো ভাসা ভাসা চিঠি লিখতেন আর নিয়মিত মনি অর্ডার পাঠাতেন। সেই গ্রামের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বৃদ্ধবৃদ্ধারা প্রতিদিন বিকেলে একটি রুগ্ন চেহারার কিশোরের চারদিকে বসে ষোড়শ শতকের বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ শুনতেন তার কাছে। দিনের পর দিন এরাই শ্রোতা। তবে একটা মনে রাখার মত ব্যতিক্রম ঘটেছিল একবার। চরমপন্থী বিপ্লবী মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী একবার নির্বাচনী প্রচারের সময় সেই উঠানে এসে চুপচাপ পেছনে বসেছিলেন সেই কিশোরটির, তার পাঠ শেষ হওয়া পর্যন্ত। পাঠ শেষে পিঠ চাপড়ে সাবাসী দিয়েছিলেন তাকে। সেই সাবাসীই তখন পর্যন্ত তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা! সেখান থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ বটে। এই দীর্ঘ পথ ছিল পাকানো, প্যাঁচালো, হাঁটাও ছিল বুক ভাঙা পরিশ্রমের। কোথাও জনশূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একাকী, কোথাও কৌতুকপূর্ণ করুণা, কোথাও অনীহা, কোথাও ক্বচিৎ সহানুভূতির আবহে। সেই পদযাত্রা ছিল এক তীর্থযাত্রীর। কিন্তু সেই তীর্থযাত্রী সর্বদা তার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে সম্যক সন্ধান জানতো না। ক্লান্ত পদযুগল তাকে নিয়ে এগিয়ে গেছে। এ এক প্রকৃত মধ্যমেধাধারীর কাহিনী। সে সফল হয়েছে কেবল তখন, যখন মাঠ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।

সেই দূর প্রত্যন্ত গ্রামে, আমার জন্মভূমিতে, ছেলেবেলা থেকেই কয়েকটি গুণের জন্য আমি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের মত স্বাস্থ্যবান ছিলাম না আমি। আমি ছিলাম রুগ্ন চেহারার ও দুর্বল। গ্রামের প্রায় সব সমবয়সীর তুলনায় আমি ছিলাম কম বুদ্ধিমান। বিনা প্রয়াসে কোন জিনিস মনে রাখার ক্ষমতা ছিল আমার অসাধারণ। আর মুখে মুখে পদ্য বানিয়ে ফেলতে পারতাম আমি।

শারীরিক দুর্বলতার জন্য খেলাধূলায় আমি ভাল ছিলাম না। আমি হরিণ ছানার মত অকারণ আনন্দে উদ্বেল হয়ে নৃত্য করতে পারতাম না। ফলে আমার স্বভাব হয়ে উঠল অলস, বসে থাকার। আত্মা আমার আত্মীয়ের অনুসন্ধান করতে লাগল অতীতে। খেলার মাঠে খেলতে না পেরে খেলতে লাগলাম বইয়ের পাতায়। বইয়ের পোকা হয়ে গেলাম। আমাদের বাড়িতে একটা বিশাল কাঠের সিন্দুক ছিল। সব সময়ই ওটা বন্ধ থাকত। লাগানো ছিল একটা বিরাট ভীতিপ্রদ তালা। কী ছিল এর মধ্যে জানতাম না। কৌতূহলও ছিল না জানবার। কিন্তু আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসতেন যে অতিথি, আমার পিতৃদেব, তিনি আমার পড়ার অনির্বাণ ক্ষুধা লক্ষ্য করলেন এবং আমাকে নিষেধ করলেন ঐ সিন্দুকের বই পড়তে। এ যেন সৃষ্টি-কর্তার নির্দেশ, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া চলবে না। পিতৃদেব বৃটিশ সরকারের অতিথিশালায় ফিরে গেলেন আর আমি শয়তানের সঙ্গে চুক্তিতে সই করলাম। খুলে ফেললাম সেই যাদু সিন্দুক বাড়ির। চিচিং ফাঁক। পড়তে লাগলাম বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র,

রাজকৃষ্ণ, শ্রীশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ, মাইকেল মধুসূদন, এদের লেখা। সৌরীন্দ্রনাথের কাব্যানুবাদে শেক্সপীয়রের রচনাবলীও পড়া হয়ে গেল। সব পড়া হয়ে গেল ষষ্ঠ শ্রেণী শেষ হওয়ার আগেই। আমার পড়ার ক্ষুধা ছিল অপ্রশমনীয়। কিন্তু ঐ বয়সেই আমি কোন বোদ্ধা হয়ে উঠিনি। হরিদাসের গুপ্ত কথা, গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি, চৈতন্য চরিতামৃত ও জামাই বারিক আমি সমান উৎসাহে পড়েছি। সব যে বুঝেছি, তা নয়। বেশির ভাগই হয় আমার মাথার উপর দিয়ে নয় আমার পায়ের নিচ দিয়ে চলে গেছে। মুষিক যা করে, 'কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে করে নৈরাকার।' খায় আর কতটুকু! আমারও তাই। সবই পড়েছি। আমার পাঠকর্মের বিশাল ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে আমার মধ্যমেধার সামান্য বিদ্যামন্দির।

সমবয়সীদের তুলনায় আমি ছিলাম কম বুদ্ধিমান। নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্বটা ছিল বংশের ধারা। আমার পিতামহ কমলাকান্তের সাংসারিক বুদ্ধি বেশি ছিল না। তার ওপর ছিল পরোপকারের ঘোড়ারোগ। এই রোগের ঠেলায় তিনি এমনই বিত্তহীন হয়ে পড়েন যে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করার পর আমার পিতৃদেব রমেশচন্দ্রের আর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি। মনের ক্ষোভে তিনি দেশান্তরী হলেন। চলে গেলেন রেঙ্গুনে। চাকুরিও জুটে গেল একটা। উপার্জন ছিল ভালই। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পরোপকারের ঘুণ তাঁকেও ছাড়েনি। সুতরাং রোজগার ভাল করলেও জমাতে পারেননি কিছুই। আরও কথা, কেমন করে জানি তিনি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে আত্মীয়তা করে ফেলেন। পুলিশ তক্কে তক্কে ছিল, তাঁকে গ্রেফতার করে সরকারি অতিথিশালায় নিয়ে গেল। চার বছর ধরে তিনি একটা পরিচয়হীন সংখ্যামাত্র ছিলেন। ঠিকানা ছিল কেয়ার অব, সি আই ডি, ডি আই বি, ইত্যাদি। তাঁকে কখনো বিচারের জন্য আদালতে পাঠানো হয়নি। মাঝে মধ্যে প্যারোলে বাড়ি আসতে পারতেন। তিনি ছিলেন আমার পিতামহের সন্তান। সুতরাং সুবোধ বালকের মত মনে করলেন যে বৃটিশ সরকার বুঝি তাঁর পরিবারকে সুখে রাখার জন্য সাহায্য করবে। তাই তিনি আবেদন পাঠালেন সরকারের কাছে তাঁর পরিবারকে সাহায্য করতে অথবা তাঁকে মুক্তি দিতে, অথবা আদালতে তাঁর বিচার করতে। ঈশ্বর বলেছেন, "প্রতিবেশীকে ভালবাস।" এই কথা আমাদের প্রতিবেশীরা জানতেন। তাই যখন সর্বশক্তিমান এস ডি ও সাহেব সভাসদগণসহ এলেন গ্রামে, অনুসন্ধান করতে, তখন প্রতিবেশীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেখালেন আমাদের বিরাট বাস্তুভিটা, সারি সারি অর্থকরী ফলবান সুপারী গাছ, সামান্য জমি জমা যা ছিল খাদ্য-শস্য পাওয়ার, ইত্যাদি। পরিশেষে তাঁরা জানালেন যে গ্রামের গড়পড়তা পরিবারের চেয়ে আমাদের অবস্থা মোটেই খারাপ নয়। এস ডি ও চলে গেলেন। তবে তিনি এসেছিলেন তো! সুতরাং সরকারি দাক্ষিণ্যও এল—মুষ্টিভিক্ষা, মাসে দশ টাকা! আমাদের প্রতিবেশীরা তাতেও খুশী হননি।

আমি যে একটি গবেট ছিলাম তার প্রশ্নাতীত প্রমাণ দিয়েছি বারম্বার। প্রথমবার, যতদূর মনে পড়ে, সেটা ছিল স্কুলে আমার জীবনের প্রথম দিন। শিক্ষকমশায় নাম জিজ্ঞেস করছিলেন প্রত্যেকের। একে একে চারটি মেয়ে তাদের নাম বলে। আমি পঞ্চম। বললাম, শ্রীমতী প্রভাস চন্দ্র ধর। তারপর....। এমন ঘটনা ঘটেছে বার বার। ১৯৮০ সালে আমি যখন আমার ককবরক রামায়ণ আরম্ভ করি তখন কতজন গায়ে পড়ে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। বলেছিলেন যে এটা একটা নির্বোধের কাজ হচ্ছে। ঈশ্বর প্রদত্ত আমার এই সামর্থ্যকে ককবরকে নষ্ট করছি কেন? কে পড়বে? কে কিনবে? আমি বাংলায় বা ইংরেজীতে কিছু করতে পারতাম। নিদেন পক্ষে বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে রোজগার করতে পারতাম। যা হল, ওদের উপদেশ শোনার মত বুদ্ধিই আমাব ছিল না। বিশ বছর পর ওদের কথাই বোধহয় প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুবষ্কার' কবিতায় ভোলা কবির দশা হয়েছে আমাব। অর্থ জোটেনি অন্নের, রাজার গলার মালা জুটেছে পুরষ্কার। আমি বলি সবই রামচন্দ্রেব ইচ্ছায় হচ্ছে।

বালক বয়সে আমি আমার গ্রামের বড়দের কাছে একটা বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিলাম আমার অসাধারণ স্মরণশক্তির জন্য। যে কোন আগন্তুকের কাছে আমি একটা প্রদর্শ হয়ে উঠেছিলাম। অঙ্কের বই সহ তাবৎ পাঠ্যপুস্তক আমি মুখস্থ করে ফেলতাম। সুতরাং বাইবের কেউ এলেই আমাব ডাক পড়তো তাব সামনে গিয়ে আমাব পাঠ্য বইয়ের কোন একটা অংশ আবৃত্তি কবতে। করতাম। কিন্তু কোথায থামতে হবে জানতাম না। অতএব সুমন সামারিটানের নীতিগর্ভ কাহিনীটি গড় গড় কবে বলে আমি বলতেই থাকতাম, অনুশীলনী ঃ এক-নীতিগর্ভ কাহিনী কি? দুই-সামাবিটান কে? আমার ভোঁতা মাথায় এই কথাটা ঢুকতোই না যে শ্রোতারা আমাকে একটি প্রতিভাবান গর্দভ বলে ধরে নিয়েছেন। আমার মনে হয় ষাট বছর বয়সেও আমার বিশেষ উন্নতি হয়নি। আমি সহজেই ঠকে যাই। তবে অভিজ্ঞতা আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিযেছে। আমি ঠকলেও কিছু মনে করি না।

আমার মুখে মুখে পদ্য বানিয়ে ফেলার ক্ষমতাটা হয়েছিল মাটির গুণে। দীনেশচন্দ্র সেনের ময়মনসিংহ গীতিকার কথা কে না শুনেছে? ওয়ার্ডস্‌ওযার্থ স্কটল্যাণ্ডেব পাহাড়ে সলিটারী একটি মাত্র রীপার মেয়ের গান শুনে মুগ্ধ হন। কিন্তু ময়মনসিংহ জেলায় অগণিত গান জন্ম নেয়, গীত হয় এবং হারিয়ে যায় প্রতিদিন। ধান ভান্‌তে ভান্‌তে মায়েরা, গরুর দুধ দুইতে দুইতে মেয়েরা, হাটু ডোবা জলে কাদায় ধানের চারা লাগাতে লাগাতে বোনেরা, বিয়ের কনে সাজাতে সাজাতে সখীরা, নৌকা বাইতে বাইতে মাঝিরা, হুঁকো টানতে টানতে মনিষ, একতারা বাজিয়ে মুসলমান ফকীর, খঞ্জনী নিয়ে হিন্দু বাউল সদাই গান গাইছে। বেশিরভাগ গানই তাৎক্ষণিক। তখনই হওয়া, তখনই গাওয়া, তখনই ভুলে যাওয়া, কবিগান, কবির তরজা, জারি সারি-

সব হয়। সুতরাং যখন তখন যা তা ছন্দ মিলিয়ে বলতে পারা খুব একটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না আমার জন্মভূমিতে। তবে আমার এই ছন্দোবদ্ধ করার ক্ষমতা কাজে লেগেছে আমার 'রাজমালা' ইংরেজী করতে এবং ককবরকে রামায়ণ লিখতে।

আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার পিতা বাড়ি আসেন। খুব অসুস্থ। পরবর্তী মাসগুলিতে তাঁর অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে থাকে। সেদিন ছিল ৩১ ডিসেম্বর। আমি স্কুল থেকে বাড়ি এলাম খবর নিয়ে। আমি সপ্তম শ্রেণীতে উঠেছি। বাবা বোধ হয় তখনো জীবিত ছিলেন আমার হাতে দেওয়া কমলালেবুর রসের শেষ চামচটুকু নেওয়ার জন্য। মনে হল তিনি কিছু বলতে চান। কিন্তু কেবল এক ফোঁটা জল তাঁর ডান চোখের কোল বেয়ে নামল। তিনি মহানিদ্রায় ঢলে পড়লেন। আমার জগৎ মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে গেল। আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। একটা মধ্য ইংরেজী স্কুল ছিল গ্রামে। আমি তো সেটার পড়া শেষ করে বার হয়ে এসেছি। তখন বড় দুঃসময়। আমার দুঃখিনী মা পাখি-মা যেভাবে বাচ্চাকে বড় করে তোলে সেইভাবে আমরা তিন ভাইকে পালন পোষণ করেছেন। একটা বছর গেল। আমি বারম্বার পড়লাম সেই রামায়ণ আর বারবার ব্যাখ্যা করলাম, ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা দিলাম আমার ভক্তিমান অবোধ পক্ককেশ বিশ্বাসী শ্রোতৃবর্গের কাছে। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ছটফট করছিলাম। তবে সেটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। গ্রামজীবন ছিল শান্ত। এই উপমহাদেশে তখন ঝড় উঠেছিল। হিন্দু ও মুসলমানেরা যে হারে নিজেদের মাতৃভূমি ভারত ও পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তা মানব জাতির লিখিত ইতিহাসে নজীরবিহীন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে বেশি রক্তপাত ছাড়াই। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে—ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ করে তার জন্ম দেয়া হয়েছে। আর শিশু কাম্য হোক আর না-ই হোক তার জন্মের পর রক্তপাত তো হবেই। আওরঙ্গজেব-এর পুত্রের বয়স ছিল বড় কম, সে বুঝতে পারেনি তার পিতামহ বন্দিশালায় কেন। ১৯৫০ সালে আমারও বয়স ছিল বড় কম; আমি বুঝতে পারিনি হামিদ চাচা আমার শত্রু কেমন করে হন। একটা মূল্যবান বছর চলে গেল, আমার জীবনের থলে থেকে পিছলে পড়ে গেল।

সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা ফুটবল খেলছিলাম একটা ছোট কর্দমাক্ত ঘাসী জমিতে একটা পোক্ত বাতাবি লেবু (জাম্‌বুরা) দিয়ে বল বানিয়ে। গোল পোস্ট আমাদের মুঠোভরা হলুদ পাতা। এক ধারে একটা পুকুর, অন্যদিকে একটা বড় ছনের ঘর। ঐ ঘরটায় বসে দরজি কাকা নির্লিপ্ত ভাবে তার সেলাই কলে শার্ট লুঙ্গি এসব সেলাই করছিলেন। আমাদের আনন্দোচ্ছল চিৎকার উঠছিল যখন তখন; তাতে তার কাজের ব্যাঘাত হচ্ছিল না। আমাদের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে কাদাটা গায়ে বড় পুরু হয়ে লেগেছে, আর খেলা যাচ্ছে না। তখনই লাফিয়ে পুকুরে পড়ে, কোন মতে গা একটু ধুয়ে হাচলে পিছলে উঠে এসে আবার খেলা শুরু করছিলাম। সেই সময়ে

একজন লোক এলেন সেখানে। তার গায়ে একটা ভাল শার্ট। শার্ট পরাটা তখন খুব একটা চল ছিল না। লোকজন একটা গামছা কাঁধে ফেলেই ঘুরতো ফিরতো। বেশি হলে গেঞ্জী গায়ে দিতো একটা। লোকটি ঘরে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে দরজি কাকার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে তার হাতে একটা ছাপানো কাগজ আছে। আমার পড়বার উদগ্র কামনা জাগরিত হল। সুতরাং কর্দমাচ্ছাদিত শরীরে আমি ভিতরে গেলাম এবং কাছে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম কাগজটার বিষয়বস্তু কী। আমার ঔদ্ধত্যে লোকটি বিরক্ত হল। দরজি কাকা তাকে আমার ও আমার অসাধারণ পাঠ-স্পৃহার কথা বলে খান্ত করার চেষ্টা করলেন। তবু সে ক্রুদ্ধভাবে বলতে লাগলো যে কাগজটা সেই বছরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার গণিতের প্রশ্নপত্র; কোন ষষ্ঠ শ্রেণীর বালকের দুধভাত নয়। কিন্তু ততক্ষণে আমি একটা অঙ্ক পড়ে ফেললাম এবং তার উত্তরটাও তাকে বলে দিলাম। এবার তিনি প্রীত হলেন। তিনি আমাকে সেখান থেকে ভাগিয়ে দিলেন এবং দরজি কাকার সঙ্গে আমার বিষয়ে কথা বললেন। তারপর তিনি উদ্যোগ নিয়ে আমাকে ইতনা পাঠালেন। আমাদের গ্রাম ন্যামতপুর থেকে ইতনা বিশ কিলোমিটার দূরে। আমাকে পাঠানো হল গুপ্তদের বাড়িতে। (গুপ্ত ভাইদের একজন ছিলেন বিখ্যাত ভূপেশ গুপ্ত। তিনি ভারতের লোকসভার সদস্য ছিলেন।) ভূপেশ গুপ্তের বড় ভাই ডাক্তার জ্ঞানেশ গুপ্ত আমাকে স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করে খাওয়া থাকার ব্যবস্থার নিশ্চিত আশ্বাস দিলেন। ঐ বাড়িতে চার বছর থেকেছি। ডাঃ জ্ঞানেশ গুপ্ত আমার দ্বিতীয় পিতা হয়ে উঠেছেন, তাঁর স্ত্রী আমার দ্বিতীয়া মাতা, তাঁর পুত্র শেখর আমার প্রিয়তম বন্ধু। সম্পর্ক এখনো অটুট। বড় গুপ্তরা কেউ আর ইহলোকে নেই। আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলাম ১৯৫৫ সালে।

১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে এলাম। যেদিন ন্যামতপুর ছেড়ে কলকাতা চলে আসব তার আগের রাতে আমি দেখা করতে গেলাম সেই লোকটির সঙ্গে যিনি চার বছর আগে আমাকে ইতনা পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলমান এবং আমার কাছে দেবতা। তাঁর নাম ছিল আমিরুল ইসলাম। যখন দেখা করতে গেলাম তখন তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। তাঁর জ্বর। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে আশ্বাস দিলেন যে আল্লাহ্ আমার পড়বার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। কোনদিন আমার পড়ার জিনিসের অভাব হবে না। তারপর তিনি যা বললেন তা আমার হৃদয়ে বড় বড় কালো অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে। সেই সন্ধ্যায় তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তা কোনও দিন ভুলতে পারব না। তিনি বলেছিলেন, "তোর সাথে এই বিছানায় বসে আজ যদি দু'জনে একত্রে রাতের খাবার খেতে পারতাম তবে কি খুশিই না হতাম। ভয় পাস নে। ধর্ম খোয়াবার ভয়ে তোর ছোট্ট হিন্দু হৃৎপিণ্ডটা যেভাবে দাপাদাপি করছে তা আমি শুনতে পাচ্ছি। ওরকম কিছু করার জন্য আমি তোকে বলব না।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতে তুই যখন বড় হবি আর বুঝতে পারবি যে তোর ধর্ম এমন কোন উদ্বায়ী বস্তু নয় যে তা মুসলমানের ছোঁয়া একগ্রাস ভাতের পরশেই উবে যাবে, তখন আমার আজকের এই অপূর্ণ ইচ্ছা তোকে ভূতের মত তাড়া করবে। তুই আজ আমার সঙ্গে খাসনে বলে অনুতাপ করবি।" হাঁ, ঐ স্মৃতি আমাকে তাড়া করে, এই বিশাল দেশটির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত—সোনমার্গ থেকে কন্যাকুমারী, ডিব্রুগড় থেকে দ্বারকা—আমি বহুবার যাতায়াত করেছি। বহু অচেনা জায়গায় বহু বন্ধু ও অপরিচিতের সঙ্গে বসে খেয়েছি। কিন্তু ১৯৫৫ সালে আমি এমনই নির্বোধ ছিলাম যে আমি আমার ঐ দেবতার সঙ্গে বসে খেতে সাহস করিনি। আমার ধারণা ছিল যে আমি তাকে ভালবাসতে পারি, শ্রদ্ধা করতে পারি কিন্তু একজন মুসলমানের সঙ্গে বসে খেতে পারি না। আর তিনি ছিলেন এত মহান যে আমি অপরাধটি করার আগেই তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আমি ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে আগরতলার ল্যান্ড রেকর্ডস্ ডাইরেক্টরেটে একটা চাকরি পাই। আমিন মোহরার। বেতন মাসে সাতাশী টাকা। তখন একজন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক বা একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের বেতন ছিল মাসে একশ' আড়াই টাকা। এর পর একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করে ১৯৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ. ডিগ্রী পেলাম। শিক্ষার অঙ্গনে হামাগুড়ি খুব সহজ ছিল না। আমি একজন পেটুক পাঠক ছিলাম নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমার নিত্য নূতন চারণভূমির প্রয়োজন হত। আমি সমান উৎসাহে কার্লমার্কস্, মহাভারত ও মাদাম সিমঁ দ্য বিউভোঁয়া পড়তাম। উপনিষদ ও ওমর খৈয়াম আমাকে সমান আকর্ষণ করত। কিন্তু পরীক্ষা পাশের জন্য একই পাঠ্য বই বার বার পড়া একঘেয়ে ব্যাপার, ওটা আমাকে টানতো না। আমার বিরক্তি ধরে যেত। এই ব্যাপারেও আমার ঈশ্বর- প্রেরিত উদ্ধারকারী জুটে গেল। প্রথমে একজন পুরুষ মানুষ—একজন অগ্রজ সহকর্মী অমল মজুমদার। তিনি আমাকে ভালবাসতেন সুতরাং আমার সময় অযথা ব্যয় করতে দেবেন না। তিনি নিজেকে আমার বড় ভাইয়ের পদে নিযুক্ত করে জোর করে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন যাতে তিনি আমার অভিভাবক হয়ে আমার পড়াশোনা তদারকি করতে পারেন। তিনি এখনো আগরতলাতেই আছেন, আমার প্রিয়তম বড় ভাই। পরের জন একটি মেয়ে, আমার এক সহকর্মীর ভগিনী—বেলা। সে আমাকে সর্বদা তাড়া দিয়েছে। পরে সে আমার বাড়িতেই চলে এসেছে, সেখানেই থাকবে আর আমার অভিভাবক হয়ে আমার পড়াশোনার তদারকি করবে বলে। সে এখনো আমার পাশেই আছে। তার অঙ্কুশ সর্বদা তৈরি আমার অন্তরের স্থূলচর্ম বিপথগামী জন্তুটিকে পথে রাখতে। সে আমার সঙ্গে না থাকলে আমার *আত্মার যাযাবর পরিহাসপ্রিয়তা আমাকে কোন কাজেই দীর্ঘ সময় থাকতে দিত না।*

আজ আমি যা-ই হয়েছি, বহুলাংশেই তার জন্য। তারই সতত তাড়নায় 'সরব চিন্তন' মুদ্রিত হল।

ইতোমধ্যে, ইঙ্গিত তো আগেই দিয়েছি, আমি বিয়ে করেছি, চাকরিতে রেভিনিউ অফিসার হয়েছি এবং পিতা হয়েছি একটি কন্যার—রূপা। ১৯৬৯ সালে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ-এ আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে ইংরেজী পড়াবার শিক্ষকের পদ পেলাম। একটা স্বপ্ন আমার বাস্তবায়িত হল। ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ। আমার বলতে হল না, "হে প্রভু, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ।" তিনি এলেন স্ব-ইচ্ছায়। আমার প্রবেশাধিকার লাভ হল ত্রিপুরার সর্বোত্তম গ্রন্থাগারটিতে—আমার কলেজের গ্রন্থাগার। বিনা প্রার্থনায় আল্লাহ্ আমাকে দোওয়া করলেন। ১৯৫৫ সালে করা আমিরুল ইসলামের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হল। ১৯৭০ সালে আমার পুত্র প্রসূনের জন্ম হয়।

১৯৭৫ সালে ভাষাতত্ত্বের পাঠ নিতে গেলাম হায়দরাবাদের সেন্ট্রাল ইন্স্টিটিউট্ অভ্ ইংলিশ অ্যাণ্ড্ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেজ্-এ। সেখানে ছিলাম দু'বছর। এই প্রবাস আমার জীবনের লক্ষ্যই বদলে দিয়েছে। ভাষাতত্ত্ব শিখে ফিরে এসেই ককবরক শিখেছি। ককবরকের প্রথম ভাষাতত্ত্ব-ভিত্তিক ব্যাকরণটি লিখেছি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ এই ষোল বছর পূজা করেছি ত্রিপুরার, ককবরকের। এ পূজার প্রসাদ ককবরক রামায়ণ।

তবে ককবরক রামায়ণ লেখার মধ্যেই সামান্য অন্য কাজও হয়েছে। ককবরকের ব্যাকরণ, রাজমালার ইংরেজী অনুবাদ, দু'চারটে স্কুলের পাঠ্যবই, ক'টা বাংলা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প লেখা হয়েছে। যদি বা ককবরকের মন্দিরে সর্বক্ষণের পুরোহিতের কাজ করে থাকি, মাঝে মধ্যে বাংলার মন্দিরের পুরোহিতের সাজিতেও দু'টো ফুল দিয়ে দিয়েছি ওখানকার পূজার জন্য। 'সরব চিন্তন' সেই বাংলার মন্দিরের পুরোহিতের সাজিতে মাঝে মধ্যে দেওয়া দু'টো চারটে ফুলের সংগ্রহ থেকে নির্বাচিত কিছু পুষ্প। অঞ্জলি- ভরা ভক্তি উপহার—বাংলা মায়ের চরণে, ককবরক মায়ের পুরোহিতের।

একবার রেডিওতে জসীমউদ্দিনের কথা শুনেছিলাম। তিনি প্রতিদিন সকাল ছ'টায় কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসতেন আর বেলা এগারোটা পর্যন্ত সেই লেখাতেই থাকতেন। কোনদিন ভাল লেখা হত, কোনদিন আজে বাজে হত, সব ছিঁড়ে ফেলতেন। কোনদিন কিছুই হত না। এরকম নিয়ম করে বসে বড় লেখকরা লেখেন কিনা আমি জানি না। আলেকজান্ডার পোপ কাগজ ও দোয়াত কলম কাছে নিয়ে ঘুমাতেন। বহুদিন নাকি ঘুমের মধ্যে আইডিয়া আসতো, তিনি জেগে উঠে তৎক্ষণাৎ সেটি লিখে নিতেন। আমি প্রায় নিয়ম করে ককবরক রামায়ণ লিখেছি। বাকিগুলি সব তাগাদার ফলে।

আমার প্রায় সব বাংলা লেখা ফরমাশী। কেউ লেখা চাইলে, তাগাদা দিতে থাকলে তবে লিখে দিয়েছি। সুবল দে, ইন্দ্রজিৎ চন্দ, মৃণাল কর, অসীম সাহা, রাখাল রায় চৌধুরী, রবীন্দ্র পরিষদ, পূর্বোত্তর ভাষা সংস্থান—এরা চেয়েছেন তাই লিখেছি। বেশি তাগাদা দিয়ে লিখিয়েছেন ইন্দ্রজিৎ। ফরমাশী লেখাও কোন কোন সময় জগদ্বিখ্যাত হয়ে ওঠে। পোপ-এর ইলিয়াদ এবং ওদিসির অনুবাদ, মার্কস্ ও এঙ্গেল্স্-এর দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো এই রকম লেখা—জগৎ জয়ী লেখা।

'সরব চিন্তন' এর লেখাগুলি তৎক্ষণিক প্রয়োজনে ফরমাশ অনুযায়ী লেখা হলেও অবহেলার লেখা নয়। আমি কোন কাজই অবহেলায় করিনি। ঈশ্বর আমাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন সেটুকু সম্পূর্ণতই ব্যবহার করেছি। আমাকে তাঁর দেওয়া ক্ষমতার পরিমাণ সামান্যই। তবু তিনি যা করার প্রেরণা দিয়েছেন তাই সযত্নে করেছি।

"সর্বভূত হৃদয়েতে বিরাজিত, হে অর্জুন! আছেন ঈশ্বর;
যন্ত্রারূঢ় সর্বভূত মায়াবলে ভ্রাম্যমাণ করি নিরন্তর।"

চিন্তন নীরবই হয় সাধারণত, সরব হয় কালেভদ্রে। সরব চিন্তনের বিকৃত রূপ প্রলাপ, বিলাপ, ক্রোধান্ধ হুঙ্কার ইত্যাদি। সুস্থ সরব চিন্তনেরও বিভিন্ন রূপ আছে। প্রধান রূপটি হল সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম। প্রবন্ধ এই শাখার অন্যতম রূপ। এই প্রবন্ধগুলি বহু বছর ধরে বিভিন্ন পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। এবার একত্র গ্রথিত হল। যদি কারো ভাল লাগে তবেই এই গ্রন্থন সার্থক।

বিশ্বকর্মাপূজা
১৭ই সেপ্টেম্বর
১৯৯৯

—প্রভাসচন্দ্র ধর

সূচীপত্র

দেশ বন্দনা

অধ্যাত্ম বন্দনা

মানব বন্দনা

সরস্বতী বন্দনা

দেশ বন্দনা

স্বাধীনতা দিবস ও আমি

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি এক অন্য কালের অন্য জগতের মানুষ। এখনকার কালে আমার চারপাশের জগতে আমি যেন বড় বেমানান। মাঝে মাঝেই আমার অসহ্য লাগে সব। হয়তো এই মনোভাব আমার মনোবিকার হয়ে উঠতে পারতো, হয়তো আমি স্বেচ্ছায় আমার পরিবেশকে ত্যাগ করতে বাধ্য হতাম। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল। আমার এমন একটা বৃত্তি জুটে গেছে যেখানে প্রতি বছর নতুন নতুন প্রজন্মের প্রায় নিষ্পাপ মানব সন্তানেরা আমার সামনে আসছে, আমার পাশে বসছে, আমার কথা শুনছে, তাদের কথা বলছে। ওদের মধ্যে আমার প্রতিদিনের বেশ কিছুটা সময় কেটে যায় বলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈর্ষা, দ্বেষ, ভণ্ডামী আমাকে ততটা বিচলিত করতে পারছে না যতটা আমার অন্য কোন জায়গায় অবস্থান হলে তারা করতে পারতো। আমি আমার পাশে প্রবহমান তারুণ্যের স্রোতে সতত বিধৌত হচ্ছি বলে সমাজের কালিমা আমাকে মারতে পারছে না।

আমার ছোট বেলার যে সময়ের কথা আমার মনে পড়ে সেটা তো প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন। মানুষ যে কতটা দানবীয় হতে পারে তার চরমতম প্রকাশ ঘটেছিল সেই বিশ্বযুদ্ধে। যুদ্ধ আমাদের দেশে হয়নি বললেই চলে। অর্থাৎ আমাদের দেশে তেমন বোমা পড়েনি, তেমন গুলি ছোটেনি, তেমন বারুদের গন্ধ ছড়ায়নি। কিন্তু যুদ্ধের অন্যতম ফল এই দেশকে ভুগতে হয়েছে। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে অগণিত লোক মরেছে। মানুষ তার লোভের করাল দ্রংষ্টা আরও বেশী প্রকাশ করেছে। রাস্তার কুকুরের সাথে মানুষ খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে। জঠরের জ্বালায় অসংখ্য মা-বোন তাদের একমাত্র পণ্য বিক্রয় করেছে। একদিকে মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছে। অন্যদিকে এই দেশেরই মানুষ সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে পিটিয়েছে। জেলে পাঠিয়েছে, ফাঁসী দিয়েছে। একদল গোপনে বিদেশী শাসকের উৎখাতের জন্য চেষ্টা করেছে আরেক দল আরও গোপনে ঐ বিদেশীদের দালালী করেছে, স্বদেশীদের গোপন খবর বিদেশীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে হাতে টাকা, পশ্চাদ্দেশে লাথি, চাকরিতে প্রমোশন ও পরিজনের ধর্ষণ নিয়ে মৌতাতে দিন কাটিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে তখন দুটো জিনিস শিখিয়েছিল। এক—জাতিতে

জাতিতে এমন সংঘর্ষ যদি আবারো হয় তাহলে মানব জাতিটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং এর প্রতিকার দরকার। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে তার হাতে দুটো বিকল্প ব্যবস্থা আছে। হয় ধ্বংস, নয় যুদ্ধ ত্যাগ। দুই—উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো বুঝতে পেরেছিল যে এই যুগে উপনিবেশ আর রাখা যাবে না। সুতরাং দিকে দিকে দার্শনিকরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন একটি বিশ্ব সরকারের। সেই বিশ্বে একটিই সরকার থাকবে। সামরিক বাহিনী থাকবে না। সারা বিশ্বে সবচেয়ে কর্মক্ষম যে যৌবনকে সামরিক পোশাক পরিয়ে কেবল হত্যা করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা উঠে যাবে। এই বিপুল শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করা যাবে। যে কল্পনাতীত পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ অস্ত্র-শস্ত্রাদির উদ্ভাবনে, উৎপাদনে, পরিবহনে, রক্ষণে ও ব্যবহারে ব্যয় হয় তা আর হবে না। তা ব্যয় হবে খাদ্য উৎপাদনে, রোগ ও বেদনানাশক ঔষধ অনুসন্ধানে, গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণে নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দানে ও পীড়িতের চিকিৎসায়, শুশ্রূষায়। অর্থাৎ তখন আমরা আশা করতে শুরু করেছি অচিরেই পৃথিবীতে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তাহলে সামরিক শক্তি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠে যাবে। মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, ক্ষুধার অন্ন সকলের জুটবে, মাথায় আশ্রয় সকলের হবে, জীবিকা অর্জনের উপায় মিলবে উপযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষা জুটবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। তবে মানুষের স্বভাব তো আর বদলে যাবে না! সুতরাং চোর থাকবে, ডাকাতি হবে, ছিনতাই হবে, ধর্ষণ হবে। তবে পুলিশও থাকবে। লোক ন্যায় বিচার পাবে, দোষীর এমন শাস্তি হবে যে অন্যেরা অন্যায়ের পথে যেতে শতবার ভাববে। অন্যায় কিছুটা কমবে। আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম এমন এক বিশ্বের যেখানে পাশপোর্ট ভিসা থাকবে না, সারা বিশ্ব আমার দেশ হয়ে যাবে, যখন যেখানে খুশী যেতে পারবো ইত্যাদি।

কিন্তু তারপর? মানুষ তার নিজের পথে চলেছে। আজ পৃথিবীতে উপনিবেশবাদ প্রায় নেই কিন্তু রাজনৈতিক উপনিবেশবাদ উঠে গিয়ে এখন অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ কায়েম হয়েছে। এখন আর সারা পৃথিবীর মানুষ 'গড সেভ দ্য কিং' গাইছে না, কিন্তু বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদিত বস্তুর সম্ভার কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এখন আর আমাদের দেশে বিদেশী শাসক নেই। তার বদলে এখন বিদেশী বণিক এসেছে। আর এসব হয়েছে আমাদের কর্মফলে—অকর্ম ফলে। বহু বছর ধরে দেশের শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেয়ার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থায় বিদেশীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সবল হওয়ার চেষ্টা করিনি। মালিকরা কেবল ঠকিয়ে নিম্নমানের জিনিস তৈরি করে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করেছে আর শ্রমিকরা কেবল দাবি, ধর্মঘট, ফাঁকি চালিয়ে যাওয়ার রাজনীতির শিকার হয়ে অজ্ঞতার বশে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। ফলে শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মের রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে দেশে

বিদেশী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান শিকড় গেড়েছে আর আমরা স্বেচ্ছায় তাদেরকে শোষণ করতে দিচ্ছি। মজার কথা, দুঃখের কথা, এই চিত্রটা কেবল আমার দেশের নয়, চিত্রটা প্রাক্তন ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির প্রায় সবগুলিতেই এক রকম। এশিয়ায়, আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় সর্বত্রই ছকটা মোটামুটি এক। সুতরাং আমাদের সুস্থ সুন্দর সুখী মানব সমাজের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানুষ বেড়েছে, বেকার বেড়েছে, দারিদ্র্য বেড়েছে। রোগ বেড়েছে, গৃহহীন বেড়েছে, দাম বেড়েছে, নষ্টামি বেড়েছে, অপরাধ বেড়েছে,। তবু যে মানুষ এ অবস্থায় আছে তার কারণ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান নিত্যনতুন মানুষ মারার কল বানাচ্ছে বটে, কিন্তু সেই বিজ্ঞানই চিকিৎসায় কৃষিতে বিভিন্ন জিনিসের বিকল্প উৎপাদনে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে। জমিতে ধানের উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। আলু টমাটো ইত্যাদি সব্জি থেকে শুরু করে মাছ, মুরগি ইত্যাদি উৎপাদন আমাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। দু'শো গ্রাম ওজনেরও এক একটা রসুন হচ্ছে ব্রহ্মদেশের জমিতে। চিকিৎসার ও রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে। ফলে এই রকম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও মানুষের আয়ু বেড়েছে অনেক। এই আয়ু বাড়ায় সমাজের ক্ষতি হয়েছে। বিপুল সম্পদ ব্যয় হচ্ছে বৃদ্ধদের আহার, আশ্রয় ও চিকিৎসায়। লাভ হয়েছে কেবল বীমা কোম্পানীর।

সাধারণ বিপদ বা সাধারণ উৎসব সাধারণকে একত্রিত করে। দুর্গা পূজায় বা কালী পূজায় সকল সুবিধা অসুবিধা ভুলে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ মন্দিরমুখো হয়। অন্য দেশের সঙ্গে খেলা হলে দেশের মানুষ একমনে, একই উদ্বেগ নিয়ে খেলা দেখতে থাকে। দেশ জিতলে আনন্দে লাফায়, হারলে বিষাদে মলিন হয়। যুদ্ধ হলে তো কথাই নেই দেশের মানুষ হঠাৎ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে দেশের একটা সাধারণ শত্রু ছিল—বিদেশী শাসক। সুতরাং মানুষ একত্রে ঐ বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে লড়েছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মবলিদান দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর সেই সাধারণ শত্রু আর রইল না। কিছুদিন স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাধারণ আনন্দ মানুষকে একত্রে বেঁধেছিল। তার পরই মানুষের ঐক্য ভেঙে যেতে থাকে। ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগেই মায়ানমার ও শ্রীলংকা আলাদা হয়েছিল। তারা যাওয়ার সময় মূল ভারত ভূখণ্ডকে ত্রিখণ্ড করে দু'ভাগ দিয়ে পাকিস্তান নামে একটি দেশ গড়ে দিয়ে গেল—ধর্মের ভিত্তিতে। ভিত্তিটা যে কত দুর্বল তা প্রমাণ হয়ে গেল অচিরেই। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের মানুষ পূর্ব অংশের মানুষকে অত্যাচার করতে লাগলো, তাদের সঙ্গে শাসক ও শাসিতের মত ব্যবহার করতে লাগলো। পূর্ব অংশের মানুষের মুখের ভাষা, মা-বোনদের ইজ্জত, জাতীয় সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা বিপন্ন হল। সুতরাং অনিবার্য হল সংঘর্ষ ও সংগ্রাম। আর জন্ম হল বাংলাদেশের। এসব আজ ইতিহাস।

ভারতবর্ষের অবশিষ্ট যে ভারত খণ্ড হল সেখানেও খেলাটা প্রায় এক। স্বাধীনতার

তাৎক্ষণিক আনন্দ প্রশমিত হতে না হতেই রাজনৈতিক খেলা শুরু হয়ে গেল। মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল ও মানবগোষ্ঠির সাম্প্রদায়িকতা। যে অহিংসার বাণীতে কোটি কোটি মানুষ অবহেলায় বিদেশীর অত্যাচার মাথা পেতে নিয়েছিল, সেই অহিংসার মূর্ত প্রতীক গান্ধীজী লুটিয়ে পড়লেন ১৯৪৮ সালের ত্রিশে জানুয়ারী। শুরু হল হিংসার হোলীখেলা। সেই খেলা ক্রমাগত বাড়ছে। দিকে দিকে বিভিন্ন নামে কিছু কিছু মানুষ হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়ে ভাইয়ের রক্তে পৃথিবী রাঙা করে তুলছে। আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠছে অসহায় নারী, শিশুর আর্ত চীৎকারে। হাতিয়ার হাতে পেলেই মানুষ ভুলে যায় যে, অন্যের হাতেও এই অস্ত্রটাই উঠে আসবে এবং কোন এক সময় ওটার গুলি তার খুলিটাকেও উড়িয়ে দিতে পারে।

যারা টিনটিন-এর বই পড়েন তারা পড়েছেন কি কৌশলে অস্ত্র বিক্রেতারা দু'টো দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে দু'টি দেশের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করে নিজের ব্যবসা চালায়। এই খেলাটায় আরও অনেক দিক আছে। অস্ত্র বিক্রেতারা কৌশলে ভারত পাকিস্তানের মত প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে বিসম্বাদ জিইয়ে রাখছে নিজেদের স্বার্থে। এরা এখন কেবল আর দেশে দেশে লড়াই লাগিয়ে রেখেই সন্তুষ্ট হচ্ছে না। দেশের অভ্যন্তরে কৌশলে হিংসাশ্রয়ী দল তৈরি করছে। বহু জায়গায় ঐ দলগুলি নিজেরাই জানতে পারে না যে অমুক দেশের স্বার্থে তারা কাজ করছে। ফলে অস্ত্র-ব্যবসায়ী দেশের সরকারকে বাধ্য করতে পারছে অস্ত্র কিনতে; তথাকথিত সন্ত্রাস দমন করতে। অস্ত্র কিনতে, পুলিশ বল বাড়াতে, সেনাবাহিনীর খরচ বাড়াতে দেশের সম্পদ ব্যয় হচ্ছে, ফলে মার খাচ্ছে উৎপাদন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ইত্যাদি। এদিকে লাভ হচ্ছে বহুজাতিক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির।

অস্ত্র ব্যবসা, রাজনীতির ব্যবসা, ভোগপণ্যের ব্যবসার সঙ্গে এবার যোগ হচ্ছে নতুন ব্যবসা ড্রাগস্। কোটি কোটি টাকার ড্রাগস্ পকেটে পুরে নেওয়া যায়। যুব-শক্তিকে এই নেশায় আসক্ত করে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিচ্ছে বিদেশীরা। এই ড্রাগস্ আসক্ত তরুণদল পয়সার জন্য চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি করছে। নেশার প্রবলতায় ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ করছে। সমাজ ক্রমাগত ভীত হয়ে উঠছে। পুলিশের কাজ বাড়ছে। ন্যায়ালয়ে নথিপত্রের পাহাড় জমছে। মানুষ বিচার পাচ্ছে না। বিচারে বিলম্ব বিচার না করারই সামিল। কিন্তু ন্যায়ালয় অসহায়। মাননীয় বিচারপতিরাও মানুষ। তাঁদের কর্মক্ষমতারও সীমা আছে। মামলার সংখ্যা স্বাভাবিক কারণেই এত বেড়েছে যে বিচার করা যাচ্ছে না।

চারদিকে এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় সাধারণ মানুষও অসহিষ্ণু এবং অস্থির হয়ে উঠছে। ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু একথাও সকলেই আজ জানেন যে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অপবিত্র করে তুলছে রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশই। ছলে বলে কৌশলে নির্বাচন জেতাই এখন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর ধরা পড়লে কেউ লজ্জিত হচ্ছে না। সুতরাং যারা ছলে বলে নির্বাচন জেতেন, তারা অনেক অর্থ

ব্যয় করে জেতেন। অনেকে অনেক কিছু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেতেন। তাই জেতার পরই তাদের দু'টো প্রধান কাজ হয় নিজের গত নির্বাচনের খরচটা তোলা, আগামী নির্বাচনের খরচটা জোগাড় করে রাখা আর যাদের সহায়তায় ক্ষমতায় এসেছেন সেই অর্থ ও পেশীবলধারীদেরকে পাইয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করা। অতএব তারা কী করবেন তা অনুমেয়, তারা কী করেন তা তো সবাই চোখের সামনেই দেখি। ফলে চরম অশান্তি, অবিচার ও অস্থিরতা চলতে থাকে। নায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয় নিরীহ, নির্বিরোধ, নির্বোধেরা—আর পুকুর, খাল, বিল, হ্রদ, সাগর আত্মসাৎ করছে লুঠেরা।

এর ফল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। এখন গণতন্ত্র কথাটারই অর্থ বদলে গেছে। যতক্ষণ যে যার ইচ্ছানুযায়ী চলতে পারে, যতক্ষণ ইচ্ছানুযায়ী বস্তুটি মেলে ততক্ষণ গণতন্ত্র ভাল। অন্যথায় নয়। সর্বনাশের কথা এই যে, সমাজের সর্বোচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মোহান্ধতাকেই সত্য বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। শিক্ষা ও বিচারবুদ্ধির এমন অনৈক্য কদাচিৎ মনুষ্য সমাজে দেখা দেয়। ভারতের সমাজে এখন এই সর্বব্যাপী ন্যায়ের প্রতি উন্নাসিকতা, স্বার্থান্ধতা দেখা দিয়েছে। এটি একটি অশনি সংকেত।

কিন্তু দু'চারজন আছেন যারা এই অন্ধকারের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। দেহের বয়স যথেষ্ট হলেও তাদের মানসিক বয়স সে পরিমাণে বাড়েনি। আমি সেই ক'জনের একজন। আমি এখনো সেই বিশ্ব-সরকারের স্বপ্ন দেখি আর আমার চারপাশে সারা পৃথিবীতে গ্রামে গ্রামে সরকার গঠনের মহড়া চলছে। আমি মনে করি সমরায়োজন ও সামরিক বাহিনী গঠন ও পোষণ একদিন অনিবার্যভাবেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে অথচ নতুন নতুন নরগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত নতুন সমরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আস্ফালন করছে। আমি স্বপ্ন দেখি দারিদ্র্য, বেকারী নির্মূল হবে আর এগুলো ক্রমাগত দ্রুতগতিতে বাড়ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য. আশ্রয়ের ব্যবস্থা হবে সকলের আমি আশা করি। হচ্ছে তার উল্টো। সুতরাং নিজেকে কেমন বেখাপ্পা লাগে আমার। আমি বেমানান। কেবল আমার পাশে প্রতি বৎসর এক দঙ্গল নতুন প্রজন্মের প্রায় নিষ্পাপ মানব শিশু আসছে বলে তাদের মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছি।

তাই স্বাধীনতা দিবসে প্রতি বছর আমি ১৯৪৭ সালে আবার ফিরে যাই। আমার তৎকালীন মনোভাবের সঙ্গে আজকের দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান দুরত্ব দেখে বিমর্ষ হই। তবে এখনও নিরাশ নই আমি। আমার কেন জানি মনে হয় মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হবে। ক্রমাগত তলিয়ে যেতে যেতে সমাজ একদিন শক্ত মাটির নাগাল পাবে। আবার দাঁড়াবে! আবার উঠবে। আবার জাগবে। ধ্বংসের বদলে গঠনে মন দেবে। সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠবে। কিন্তু কবে?

(স্যন্দন পত্রিকা, আগরতলা, ১৫ আগস্ট ১৯৯৪)

জয় হোক মনুষ্যত্বের

একটা গল্প বলি। ইতিহাসের গল্প। এক আজব দেশের আজগুবী দিনের আধপাগল জাতির মানুষের গল্প। সত্যিকারের গল্প। প্রথিতযশা সাংসদ ভূপেশ গুপ্তের অগ্রজ, আমাদের জেঠামশাই নরেশ চন্দ্র গুপ্তের জীবনের কাহিনী। তিনি বলতেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি বিব্রত হওয়ার, সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হওয়ার, সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হওয়ার কাহিনী এটি'। কতবার কতভাবে কতজনকে যে জেঠামশাই গল্পটি বলেছেন তার আর হিসেব নেই। সেটা সাতচল্লিশের পনরোই আগস্ট। জেঠামশাই দুইটি ভাইপোকে নিয়ে বেরিয়েছেন সর্বত্র উৎসবের দৃশ্য দেখতে। ওঁরা তখন থাকেন কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউ-এর তারা রোড-এ। এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে জেঠামশাই একটা রিক্‌শায় চড়লেন বাচ্চা দুটিকে নিয়ে। রিক্‌শায় ভাড়া হবে এক টাকার মত। স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেল জেঠামশাই রিক্‌শাওয়ালাকে দিতে গেলেন পাঁচ টাকা। কিন্তু সারথি সেই পাঁচ টাকা প্রত্যাখ্যান করল। মুসলমান দরিদ্র রিক্‌শাচালক। নিকট অতীতের হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃমেধের স্মৃতি তার কাছে বোধ হয় তখনও তাজা রক্তে ভেজা। জেঠামশাই-এর হিন্দুত্ব তাঁর ধুতি, শার্টে প্রকট। কিন্তু সেই অশিক্ষিত মুসলমান করযোড়ে বলল, 'আজ ভাড়া লিবে না—আজ তৌহারের দিন। আজ মালিকভি রিক্‌শার ভাড়া লিবে না'। জেঠামশাই-এর দক্ষ যুক্তি সব বিফল। তখন তিনি একটা কৌশল করলেন। রিক্‌শাচালকের পিঠে হাত দিয়ে তাকে নিয়ে মিষ্টির দোকানে ঢুকলেন। পাড়ারই দোকান। চারজন মিষ্টি খেয়ে দাম দিতে গেলেন। দোকানী করযোড়ে বললেন, 'আজ উৎসব, স্বাধীনতার উৎসব। পয়লা বৈশাখ তো বছর আরম্ভ হয়। আজ নতুন জীবন আরম্ভ, আজ কোন দাম নেবো না। আমায় ক্ষমা করুন। আমি খাওয়াতে পারলাম, সেই আনন্দটাই আমার আজকের দাম। রিক্‌শাচালক বদন ব্যাদান করে হেসে বলল, 'সহি বাত'। জেঠামশাই ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে সবিস্তারে সেই কথা সকলকে বললেন। আমি এই গল্প শুনেছিলাম একান্ন সালে। চার বছর পরে। ততদিনে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক হিন্দু, মুসলমান, শিখের রক্ত বয়ে গেছে।

সাতচল্লিশের পর স্বাধীন ভারত পঞ্চাশ বছর পার করে দিয়েছে। স্বাধীনতার

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালিত হচ্ছে দেশে এখন। ভারতের মানুষ এখন নিজেদের সরকার গঠন করার অধিকার ভোগ করছে। স্ত্রী-পুরুষ, গরীব-ধনী, শিক্ষিত-নিরক্ষর, সাধু-বদমাস, পরম-বুদ্ধিমান-মানসিক প্রতিবন্ধী, মালিক-দাস, নির্বিশেষে সকলের এই অধিকার স্বীকৃত হয়ে গেছে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। একমাত্র যোগ্যতা মানুষ হওয়া আর আঠারো বছর বয়স হওয়া। আমার দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করে আমরা নিষ্ফল আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকি। কিন্তু রাজনৈতিক দলের সংখ্যার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আদর্শশূন্য স্বার্থান্বেষী মানুষ গণতন্ত্রের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। একটা সাধারণ অঙ্ক কষলেই গণতন্ত্রের ইন্দ্রজালটির ফাঁকি ধরা যায়। মনে করা যাক হবু রাজার দেশের ভোটারের সংখ্যা এক হাজার। সে দেশে ক্ষমতাসীন দলের প্রধানমন্ত্রী গবু। নির্বাচন এল। চারটি প্রধান দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল নির্বাচনে। ত্রিশ শতাংশ লোক ভোট দিল। এগারো শতাংশ ভোট পেয়ে গবুর দল ক্ষমতায় কায়েম রইল। গবু আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন। এই এগারো শতাংশ ভোট যারা পেলেন তাদের আসলে সমগ্র দেশবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতার পাঁচ শতাংশের সমর্থন পাওয়া হল। যদি ভোটার তালিকায় কারচুপি, ভোট গণনায় অসততা ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত কৌশলগুলি এর মধ্যে ধরা যায় তাহলে প্রকৃত সমর্থনের পরিমাণ আরো কমে যাবে তা তো সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে এখন এই সামান্য শতাংশের নেতৃত্বের লম্ফ ঝম্প চলছে বিভিন্ন রাজধানীতে।

সাতচল্লিশের স্বাধীনতা দিবসে গরীব মুসলমান রিক্‌শাচালক কলকাতার তারা রোডে জেঠামশাই-এর কাছ থেকে পাঁচ টাকা নেয়নি। সেদিনের পাঁচ টাকা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের প্রায় দুশো টাকার সমান হবে। সেদিন মিষ্টি দোকানের দোকানী জেঠামশাই-এর কাছ থেকে মিষ্টির দাম নেয়নি। আজ সাতানব্বই-এর আগস্টে বহুজনকেই বলতে শোনা যায় যে এই স্বাধীনতা না এলেই মঙ্গল হতো। দেশে অত্যাচার অনাচার ভ্রষ্টাচার এত বেড়েছে যে স্বাধীন ভারতের মানুষ এখন পরাধীনতাই ভাল ছিল বলে মনে করছে। এই পশ্চাৎপট নিয়েই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হচ্ছে নেতাদের দ্বারা। শুধু নেতাদের দ্বারা। নেতা আদমীতে কি তফাত জিজ্ঞেস করা হলে একজন বলেছিলেন যে তফাত আছে একটু। আদমী চাহে তো নেতা বন সক্‌তা। লেকিন নেতা চাহে তো আদমী নহী বন পাতা। আজ সারা দেশে নেতৃত্ব চলে যাওয়া নেতা, নেতৃত্ব স্থায়ী রাখার চেষ্টায় রত নেতা, নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য সর্ব কর্ম ত্যাগ করে কেবল নেতার কাছা ধরে টেনে তাকে ফেলে দিয়ে আসন খালি করে সেই আসনে বসার চেষ্টায় রত হবু নেতাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে আদমী আর বেশি নেই। নেতারা নেতৃত্ব পাওয়া গেলে সেটা রক্ষা এবং নেতৃত্ব চলে গেলে সেটা পুনরায় দখল করার চেষ্টায় হোলটাইমার। সুতরাং দেশের বা সমাজের কাজ করার সময় তাদের কোথায়? কাজ তারা করতে পারছেন না কিন্তু তারা বিশ্রাম

তো করছেন না, সন্ন্যাসও নিচ্ছেন না। কি করছেন? শ্রীভগবান শ্রীমদভগবদগীতায় অর্জুনকে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম বুঝিয়েছেন। আমাদের ভূতপূর্ব নেতা, নেতা ও হবু নেতারা (সংক্ষেপে নেতা-ত্রিমূর্তি বলা চলে) 'কাজ' বা কর্ম করতে পারছেন না, কিন্তু তাঁরা 'কাজ ছেড়ে' সন্ন্যাস নেননি, অর্থাৎ তারা অকর্মও অবলম্বন করছেন না। সুতরাং কি করছেন তারা—সেই প্রশ্ন ওঠা যথাযথ। উত্তর গীতায় দেওয়া আছে, তারা বিকর্ম বা বিপরীত কর্ম বা যা করা অনুচিত সেই কর্ম করছেন। সেটা কি? সেটা হল ধ্বংসাত্মক কর্ম।

যেদিন থেকে মানুষ 'সভ্য' হতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই সে নেতা নির্বাচন করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইয়ে এসব কথা আছে। নেতা সাধরণত বীর্য শুল্কে নেতৃত্ব লাভ করতেন এবং বীরত্বের জোরেই নেতৃত্ব বজায় রাখতেন। সেই বীরত্ব ছিল বাহুবল। ক্রমে বাহুর স্থান গ্রহণ করল মস্তিষ্ক। নেতারা উপলব্ধি করলেন যে নেতৃত্ব বজায় রাখার সহজতম কৌশল হচ্ছে প্রজাপুঞ্জকে বিভক্ত করে পরস্পরের বিরুদ্ধে কলহরত রাখা। ইংরেজরা এটিকেই বলে Divide and rule. আমাদের স্বাধীন দেশের নেতা-ত্রিমূর্তিও এই খেলায় সতত নিরত। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সংবিধান অনুসারে এই দেশে ধর্ম, জাত-পাত, ইত্যাদি নিয়ে কথা চলে না। তবে সকলেই নিজ নিজ ধর্মের বা জাতের মানুষকে সংগঠিত করে তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটা স্মরণ করা উচিত যে কারও অন্য ধর্ম বা জাতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার অধিকার নেই। কিন্তু কার্যত এই বিপরীত কর্মেই নেতা-ত্রিমূর্তি সর্বদা লিপ্ত আছেন। সর্বত্র নেতারা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য অন্য ধর্ম বা অন্য জাতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন। এই বিষোদ্গার বলায় বা শোনায় একমাত্র লাভ নেতার। নেতারা জাতের বিরুদ্ধে জাতকে, ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মকে উত্তেজিত করে তুলছেন। এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। দেশ দুর্বল হচ্ছে। বিদেশী শক্তি সেই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দেশদ্রোহিতায় মদত দিচ্ছে, ধর্মের নামে ত্রিধা-বিভক্ত এই দেশটাকে আরও কতগুলি খণ্ডে বিভক্ত করতে পারলে, তাদেরকে পরস্পরের প্রতি যুদ্ধরত করতে পারলে অস্ত্র ব্যবসা আরও অনেক গুণ বাড়বে। বড় বড় বিদেশী শক্তির এই চক্রান্তে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত হয়ে আছে প্রতিবেশী দেশের মানুষ, পঞ্চাশ বছর আগে যারা আমাদের মতই ভারতবাসী ছিল এবং বিদেশী শাসক আমাদের সকলকে এবং কুকুরকে রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীতে উঠতে দিত না। সাহেবের কুকুর উঠতে পারত। আর অসহায় কোন রাজনৈতিক দলের কাছে নিজেকে বিক্রয় করে ফেলেনি এমন শিক্ষিত মানুষ দেখতে পাচ্ছেন যে এইসবের কারণ গণতন্ত্রের অপব্যবহার। (রাজনৈতিক দলের সংখ্যা সীমিত করা আশু প্রয়োজন। কেউ সেই কথা বলছেন না) কি ভাবনা ভাববে সে স্বাধীনতার পঞ্চাশৎ বর্ষে? সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মত 'পরাধীনতা ভাল ছিল' একথা বলা যে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস শ্রীকান্ত-এর প্রথম দিকেই অননুকরণীয় মেজদার চরিত্র

দেখতে পাই। শ্রীকান্ত-সহ সব ছোটরা তার অত্যাচারে অস্থির। একদিন হঠাৎ পিসিমার হস্তক্ষেপে মেজদার অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটে। যতীন এসে দাবী করে যে তার জন্যই এই অসম্ভবটা সম্ভব হয়েছে। সে তার কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার চাইল। বলল, 'ছোড়দা, তোমার কলের লাট্টুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে তা বলে দিচ্ছি।' এর পর আছে—

'আচ্ছা দিলুম। নিগে যা আমার ডেস্ক থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাট্টুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেক পূর্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।'

এরপর শ্রীকান্তরূপী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মন্তব্য করছেন, 'এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ। আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা কম নয়।'

সত্যি কথা। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ এমন হয়। এই আনন্দেই আমাদের জেঠামশাই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা ভাড়া এগিয়ে দিয়েছিলেন রিক্‌শাওয়ালার হাতে। এই আনন্দেই রিক্‌শাওয়ালা সেই পাঁচ টাকা নেয়নি। সেই আনন্দেই মিষ্টিওয়ালা সেদিন বিনি পয়সায় মিষ্টি খাওয়াচ্ছিল সকলকে। কী সেই আনন্দ আজকের প্রজন্ম তা জানতেই পারলো না। স্বাধীনতা মানুষকে দেয় এক অনির্বচনীয় স্বতন্ত্রতা। সেই স্বতন্ত্রতা আজ ভারতের মানুষের নেই। ভারতে আজ মানুষই নেই। এখানে আছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ, উপজাতি, দলিত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। এখানে ডাকাতি হয় এই সব শ্রেণীর কারোর বাড়িতে। পরীক্ষায় ভালো করলে শ্রেণীর নেতৃবর্গ তাদের সম্বর্ধনা দেয়। ভোট পাওয়ার জন্য মন্ত্রী অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে শতকরা একশ ভাগ অসত্য অভিযোগ তুলে নিজের শ্রেণীকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। প্ররোচিত করে। এখানে রোগ হলে, অনহারে মারা গেলে, খুনোখুনি করে হাসপাতালে গেলে, চোরকে ধরে থানায় দিলে, নারীর শ্লীলতাহানি হলে চিকিৎসা, খাদ্য বা অন্য কিছু বিষয়ে অন্যায় হলে এবং বিচার প্রার্থনা করলে অন্যায়কারীর শাস্তির ব্যবস্থা করার আগে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর শ্রেণী নির্ধারণ করা হয়। তিনি বা তারা কোন্ নেতার স্বার্থ ছত্র আচ্ছাদিত তা দেখা হয়। তারপর তদন্ত হয় এবং সবশেষে প্রয়োজন হলে দোষীকে পুরস্কার ও নির্দোষকে তিরষ্কার করা হয়। সুতরাং অজ্ঞ মানুষ (এরা মানুষ) এখন বলেই ফেলে কী দোষ ছিল বিদেশী শাসনে। তারা থাকলেই ভাল হত। ওরা আমাদেরকে কুকুর ভাবত, এই তো? তা এখনো ভাবে। এখন স্বদেশীরা ভাবে। ক্ষমতায় গেলে গরুরও মাংস খাওয়ার দাঁত গজায়, ক্ষুরের জায়গায় তীক্ষ্ণ নখসহ থাবা হয়। বিশ্বাস না হয় জর্জ অরওয়েল পড়ে দেখুন।

আমার বাবা বিনা বিচারে রাজবন্দী (সিকিউরিটি প্রিজনার) হয়ে জেলে

কাটিয়েছেন বহু বছর। তিনি বলতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে দেশ স্বাধীন হলে বিনা বিচারে বন্দী কেউ থাকবেন না। অবিচার থাকবে না। আমিও বিশ্বাস করেছি অনেকদিন। নির্বোধে যেমন বিলম্বে বুঝে আমিও বিলম্বে বুঝেছি যে নিবুর্দ্ধিতা আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এখন কেউ আর এসব বিচার টিচারের কথায় বিশ্বাস করেন না। যাদের বিচার হোক সকলেই চান তাদের বিচার করা যাচ্ছে না। নির্দোষ বহু মানুষ বিনা বিচারে কারাগারে জীবন কাটাচ্ছেন। বিচারের নামে দলের মানুষকে জাতীয় কোষাগার থেকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিচার প্রার্থনাকারী দেওয়ালে মাথা ঠুকছেন। তার আবেদন নিবেদন সব অরণ্যে রোদন হয়ে যাচ্ছে।

আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আগরতলার একটা কলেজে পড়ান। তাঁর এক আত্মীয়া অত্যন্ত অন্যায়ভাবে একটা পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সব চেষ্টা করেও ফল না পেয়ে তিনি আমার বন্ধুকে ধরলেন। বন্ধুটি নিজেকে অরাজনৈতিক বলে থাকেন। বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ও তার ঘনিষ্ঠ ছিলেন প্রাক্-মন্ত্রীকালে। অনেক চিন্তা করে একটা দরখাস্ত লিখে মহিলাটিকে নিয়ে গেলেন মন্ত্রীর বাড়িতে। মন্ত্রী অনুগ্রহ করে তাঁকে চিনলেন। তাদের কথা শুনলেন এবং বললেন যে তিনি 'কেইস'টা জানেন— ওটা পাবে না, পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বন্ধুটি আহত হয়েও দরখাস্তটি এগিয়ে দিয়ে বললেন যে আপনি শুধু বিষয়টা আপনাকে জানানো হোক বলে ডিরেক্টরকে লিখে দিন। মন্ত্রী দিলেন না। বললেন অফিসে দিতে। অপমানিত হয়ে বন্ধু এটি অফিসে জমা দিলেন। যিনি রাখলেন তিনিও বন্ধুর জানাশোনা। অথচ তিনমাসে ছয়দিন গিয়েও দরখাস্তটি সংশ্লিষ্ট ডাইরেক্টরেটে পাঠানো গেল না। এদিকে ঠিক এইরকম একটি 'কেইস' ছিল উদয়পুরের একজনেরও। সে একজন ক্ষমতাসীন দলের নেতার আত্মীয়। নেতা এলেন, বললেন, দরখাস্ত রাখা হোল এবং দুইমাসের মধ্যে 'কেইস' শেষ হয়ে গেল। এই বিচার! এই আমরা আইনের চক্ষে সকলে সমান! ক্ষমতাসীন লোকেরা কী নির্লজ্জভাবে এদেশে বিচারকে এড়িয়ে চলছে সকলেই দেখছেন। সুতরাং কেউ যদি বলে 'এই স্বাধীনতা না এলে কী হতো' কী বলবেন তাকে?

বড় বড় নেতারা এবং বড় বড় রাজনৈতিক দলসমূহ পরস্পরের প্রতি এমন সব অভিযোগ আনছেন যে সাধারণ ভাবেই এখন ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। ভারত নামক এই রাষ্ট্রটিতে এখন সমস্যা প্রায় কিছুই নেই। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, চিকিৎসার অভাব, আশ্রয়ের অভাব, জীবিকা নির্বাহের উপায়ের অভাব, নারীর নিরাপত্তার অভাব, সন্ত্রাসের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা-সম্পত্তি সব বিপন্ন হওয়া, যাতায়াত ব্যবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, ইত্যাদির কোনটাই এখন আর কোন রাজনৈতিক দল বা নেতার কাছে উদ্বেগের অথবা ধ্যান ভঙ্গ হবার কোন কারণ নয়। এখন সকলেরই মুখে একটি কথা—একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে যেন কোন মতেই ক্ষমতায় আসতে না দেওয়া হয়। অমুক কয়েক হাজার কোটি টাকা চুরি

করেছেন? কুছ পরোয়া নহীঁ। পরে দেখা যাবে। ওকে কিছু বলে ওই দলটির ক্ষমতা বাড়ানো উচিত হবে না। তমুক ডাকাত ছিল? ঠিক আছে। ওকে রাজনীতিতে আনো তাহলে ঐ কেন্দ্রে ওকে দিয়ে ওই দলটিকে ঠেকানো যাবে। তমুক অশিক্ষিত অসচ্চরিত্র নরঘাতক? ওসব ছেঁদো কথা এখন রাখ। একটা কাজ কর, পুলিশকে বলে দাও ওর ওপর সুনজর রাখতে। তাহলে ঐ রাজনৈতিক দলটি ওখানে প্রবেশ করতে পারবে না। এই আমার ভারত, সোনার ভারত, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের ভারত।

সুর্বণজয়ন্তী বর্ষে ভারতের সর্বত্র পাপের পাহাড় জমে উঠেছে। যারা সকাল বিকাল মন্দির, মসজিদ গীর্জায় যায়, যারা ওসবের ধারে কাছেও যায় না এবং যারা ওসব জায়গা এবং ওসব জায়গায় যারা যায় তাদের নামে অশ্লীল গালিগালাজ করে, তারা কেউই এখন অনৈতিক কাজ করতে ভয় পায় না। মানুষের খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দিয়ে এবং কারচুপি করে সরকারী অর্থের নয়ছয় করা এখন পুরানো হয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। হাসপাতালের বরাদ্দ দুধ নেতার বাড়িতে গেলে এখন আর কেউ কিছু মনে করে না। নতুন চুরির ক্ষেত্র হচ্ছে জুতা ও পশুখাদ্য। কোটি কোটি টাকার পাহাড় জমানো হচ্ছে গোরুকে উপোসী রেখে। দুদিনে ভেঙ্গে পড়ছে কোটি কোটি টাকার সেতু। বিদ্যালয়ের ছাদ মেরামত হচ্ছে ফি বছর, কিন্তু জল পড়া বন্ধ হচ্ছে না। সরকারী জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আসল দামের এক দশাংশে। বাকি নয় অংশ ভাগাভাগী হয়ে চলে যাচ্ছে ক্ষমতাসীনদের হাতে। তিন হাজার টাকা বেতনের কেরানি, মন্ত্রীর শ্যালক, তিনি হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়, তিনি হাজার টাকা ছেলে মেয়ের প্রাইভেট টিউটরকে দেয়, পূজার সময় তিন হাজার টাকা দিয়ে স্ত্রীর শাড়ি কেনে, রোজ একশ টাকার মাছ, সব্জি ফল আনে। সেই কেরানির অফিসার ছেলেমেয়ের অসুখ করলে নিজেই বড়ি কিনে আনেন, কন্ট্রোলের দোকানের চাল খান, সাশ্রয়ের জন্য শনি, রবিবার, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমায় নিরামিষ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পাড়ার সুন্দরী মেধাবী এম. এ পাশ মেয়েটি রোজগারের খোঁজে ক্লাস এইট পাশ 'সাফারি' পড়া নেতার ছেলের ঝকঝকে মোটর-সাইকেলের পেছনে বসে রোজ বেরোয়। পয়সা আনে। বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে। মেয়ের বাপের বিড়ি, বোন-ভাইয়ের বই আসে। এম. এ পাশ ছেলে লাকড়ি বেচে, চায়ের দোকানে কাজ করে, নইলে পোস্টার লেখে, আঠা মেখে সেই পোস্টার দেয়ালে সাঁটে। সেই পোস্টার কারো কালো হাত গুঁড়িয়ে দিতে আহ্বান জানায় অথবা কারো হাত শক্ত করতে আদেশ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ায় বা পড়ায় না তারাই প্রশ্ন করে, খাতা দেখে। তারাই প্রাইভেট ট্যুইশান দেয়। এখন আর রোজ রোজ পড়তে যাওয়া, বসা, শোনা ও লেখার গোলকধাঁধা পার হতে হয় না। প্রতি পেপারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নের জেরক্স করা উত্তর নিয়ে মোট এক বছরের বেতন দিয়ে গেলেই পাশ। পঁচানব্বই শতাংশ গ্যারান্টিও। পঁচানব্বই শতাংশ এই কারণে যে,

একটা রিস্ক ফ্যাক্টার তো থাকেই। যারা এই রকম করে পয়সা রোজগার করেন তারা এই বিষয়টা জানেন এবং সেটা আগেই বলে দিয়ে নিজেদের সরলতা ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ বেঁধে নেন। এই আমার ভারত। স্বাধীনতার আগে এরই জন্য কোরাস গেয়েছি কবির সঙ্গে 'বল বল বল সবে/শত বীণা বেণু রবে/ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ধর্মে মহান হবে/কর্মে মহান হবে/নবদিনমণি/উদিবে আবার/পুরাতন এ পূরবে'। হায়রে ভগবান!

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এই ভারত। গণতন্ত্র চিরকালই নিম্নমানের শাসন ব্যবস্থা দিয়েছে, দিয়েছে বিচারের নামে প্রহসন। জনগণেশ কোন কালেই সুব্যবস্থা বা সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করার জন্য খ্যাত হয়নি। গণতন্ত্র সক্রেতিস ও যীশুখ্রিস্টকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে, আম্রপালীকে বারবণিতা করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধর্ষণ করে হিটলারের মত উন্মাদ ক্ষমতায় এসেছে, লক্ষ মানুষের বাহবা পেয়েছে, কোটি মানুষের প্রাণ নিয়েছে। কিন্তু আমার ভারতে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে গণতন্ত্র তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে বিহারে। বহু কোটি টাকার গাওয়ালা কেলেঙ্কারীর নায়ক গণতান্ত্রিক ভাবেই বিচারকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বহুদিন। পরে নিজের স্ত্রীকে গদিতে বসিয়ে প্রশাসন চালিয়ে গেছে বকলমে, নিজে পুলিশের হাত এড়িয়ে আদালতে আত্মসমর্পণের নাটক করেছে এবং আদালত তাকে ছেড়ে না দিয়ে বিচার বিভাগের অধীনে মহারাজকীয় ব্যবস্থায় রাখলেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হরতাল ডেকে তাণ্ডব চালিয়েছে। সবই গণতন্ত্র। যারা গণতন্ত্রকে ভালবাসেন তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন গণতন্ত্রের এই করাল ও কুৎসিত তাণ্ডব দেখে। গণতন্ত্রের আয়ু সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠছেন তারা। গণতন্ত্রের বিকৃতি কতদূর সম্ভব তার একটা গল্প প্রচলিত হয়েছে বিহারের পশ্চাৎপটে। নেতা তার নেতৃত্ব যে অবিসম্বাদী তা প্রমাণ করার জন্য সভা ডেকেছেন। যাদের আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ নেই তারাই আসতে পেরেছিল সভায়। অন্যেরা আসতে পারেননি। সভায় সকলে নেতার প্রশংসা করে নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ বেসুরো হয়ে গেল ব্যবস্থা। একজন বর্ষীয়ান সর্বজনশ্রদ্ধেয় সদস্য উঠে অন্য সুরে কথা বলে চলছেন! নেতার শ্যালক ও অতিশয় ক্ষমতাবান তরুণ সদস্য দাঁড়িয়ে উঠে বক্তার নাম, পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। বিস্মিত বিরক্ত অপমানিত সদস্য নিজের পরিচয় বললেন। তৎক্ষণাৎ দশজন দাঁড়িয়ে বললেন যে বক্তা মিথ্যাবাদী, তিনি অন্যের নামে পরিচয় দিচ্ছেন। বিষয়টা ভোটে দেওয়া হল, বক্তা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলেন এবং সকলের উপহাসের চীৎকারের মধ্যে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

স্বাধীনতার জন্য কোটি কোটি মানুষ পথে নেমেছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না তখন বৃটিশের সরকারকে কায়েম

রাখতে যারা শক্তি যোগাচ্ছিলেন তাদেরও পঁচানব্বই শতাংশ ছিলেন ভারতীয়ই। বহু রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, কোন কোন রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং কোন দল ব্রিটিশের পক্ষে অন্য দলের ওপর গোয়েন্দাগিরি করেছে বলে শোনা যায়। সেই সব কাহিনী মুদ্রিত হয়ে গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্বকালে দুর্যোধন 'রাজা' নামে খ্যাত ছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার পক্ষেই সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল। জতুগৃহ বা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রচেষ্টায় দুর্যোধনের ভোট কমেনি। আমার বাবা জেলে থাকার সময় পাড়ার লোকেরা অকারণে আমাদেরকে উত্ত্যক্ত করেছেন প্রকাশ্যে। কেউ কেউ আমাদেরকে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, প্রয়োজনে সহায়তাও করেছেন। তবে তারা এসব করেছেন গোপনে, সভয়ে। ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা করার কী নিলর্জ্জ চেষ্টা করেছেন এই দেশের কত লোক। এখনো তাই হয় সবকারের সপক্ষে। কর্মচারী সংগঠন ভাঙ্গার চেষ্টায় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার করা হয়। না পারলে এক ডজন মামলা রুজু করে দিয়ে হেনস্তা করা হয়। পুরস্কার হিসাবে সরকারি গাড়ি চড়া, পদোন্নতি, স্ত্রীর ভাল জায়গায় বদলী ইত্যাদি পাওয়া যায়। মানুষরূপী সারমেয় যখন পা চাটতে আরম্ভ করে তখন কার পা চাটছে সেটা দেখে না, দেখে যে পায়ের মালিক সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন কিনা। যারা বিকাশ রায় অভিনীত 'বিয়াল্লিশ' ছবিটি দেখেছেন তাদের মনে পড়বে কেমন করে পকেট থেকে টুপি বার করে মাথায় পরেছিল কারবারী।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে আমরা চতুর্দিকে আশাহত হয়ে কেবল বিচার বিভাগের দিকে তাকিয়ে আছি। শুনতে পাই সেখানেও ক্ষমতাবান দুষ্কৃতী প্রভাব বিস্তার করতে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখনো তারা সফল হতে পারেনি। পারলে আমরা তা জানতে পারতাম না। চতুর্দিকে মেঘের অন্ধকার, সেই মেঘ পাপের। মাঝে মাঝে বজ্রপাত হচ্ছে—সে অট্টহাস্য সন্ত্রাসের, বিকৃত গণতন্ত্রের, দুর্যোধনের। চোরা-গোপ্তা বিনাশ চলছে সজ্জনের—অশ্বত্থামারা নিশার অন্ধকারে কার্য্যরত। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে আমাদের গণতন্ত্র রাহুগ্রস্ত। কিন্তু আশাহীন স্থানের নাম নরক। সুতরাং আমরা সেই বিশ্বাস রাখছি যে রাত যত গভীর হয় ঊষা তত নিকটে আসে। কেমন করে হবে বলার ক্ষমতা আমার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি যে দিন বদলের দিন এসে যাচ্ছে। এই নির্লজ্জ পাপাচার সহসাই শেষ হবে। সমাজ এই পাপাচারে ডুবে গিয়ে নতুন সমাজ জেগে উঠবে। সেই আশায় দিন গুনছি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সেই কামনা সকলে করলে পুঞ্জীভূত কামনার শক্তিতে নতুন যুগ জন্ম নেবে। বলি—জয় হোক মনুষ্যত্বের।

১৫ আগস্ট ১৯৯৭, 'স্যন্দন' পত্রিকা, আগরতলা

এবার কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো

কথা হচ্ছিল এক তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। ছেলেটি ছোটবেলা থেকে মেধাবী এবং অস্থিরমতি। লেখাপড়া ও পরীক্ষায় সর্বদাই নজরকাড়া ছেলে ছিল সে। আবার দুষ্টুমীতে ও দৌরাত্ম্যেও তার উপস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবে পরীক্ষায় অসদুপায় ইত্যাদিতে সে ছিল না—তার এসবে কোন দরকার পড়তো না। বিশিষ্ট মেধার ফলে অতি অল্পক্ষণ পড়াশোনায় দিয়েও সে অনায়াসে উৎরে যেত সবার আগে। কিন্তু ফুল ফল চুরি, খেলায় দীর্ঘক্ষণ থেকে সমবয়সীদের পড়াশোনার ক্ষতি করা, নিকটে ও দূরে অসংখ্য বন্ধু নিয়ে চলা, ইত্যাদিতে তার জুড়ি ছিল না। এখন সে বড় হয়েছে এখন সে ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে। চাকরির একটা সুযোগ এসে গেছে হাতে। মধ্যপ্রদেশে একটা জায়গায় চাকুরি হয়েছে। হাতে তার কলকাতা যাওয়ার টিকিট। ছ'দিন পরে সে যাচ্ছে। কবে আবার এই আগরতলায় ফিরবে জানে না। মনে প্রবল উৎসাহ। কিন্তু বাড়ির জন্য, আগরতলার জন্য, তার মনে কোন দুঃখ নেই। আমার খুব অবাক লাগলো। মনে পড়ে গেল আমার নিজের বিগত জীবনের কথা। বাড়ি ছেড়ে যখন বাইরে যাই, তখন আমার মনেও প্রবল উৎসাহ ছিল। কিন্তু মায়ের জন্য, ভাইদের জন্য, বন্ধুদের জন্য, বাড়িটার ও গ্রামটার মাটির ও গাছপালার জন্য, খোড়া'মালিকহীন নেড়িকুত্তাটার জন্য মন ভীষণ খারাপ হয়ে পড়েছিল। বিষয়টা অনেকটা সদ্য বিবাহিত কন্যার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার মত। ভাল বিয়ে হলে কনেটির দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না। বস্তুত সে সুখীই হয়। কিন্তু বাপের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় তার কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। কেবল বাবা, মা বা আত্মীয়-স্বজনই নয়, তার কান্নার সঙ্গে চোখের জল পড়ে সমবেত প্রতিবেশিবর্গের সকলের। এটাই আমাদের কাছে স্বাভাবিক।

কিন্তু আজকাল এই স্বাভাবিক ব্যাপারটি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। রেজিস্ট্রার মহোদয়ের দপ্তরে গিয়ে তাঁর খাতায় নিবন্ধভুক্ত করিয়ে বিয়ে করলে তো কান্না-টান্নার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু আমাদের চিরাচরিত প্রথামত, বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের পছন্দ করা মতে, পুরুত ডেকে, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণজনিত ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে, বরযাত্রী ও বরাহ্বানে, ইতর জনে মিষ্টান্ন দিয়ে ভুঁড়িভোজ করিয়ে বিয়ে

দিলেও আজকাল অনেক কনেই হেসে খেলে বরের সঙ্গে গাড়ীতে চড়েন। সমবেত জনগণের মধ্যে যারা বর্তমান প্রজন্মের তারা আহ্লাদিত হন ও প্রশংসাপূর্ণ আলোচনায় সময়টা সরগরম করে তোলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদায়কালে হাস্যময়ী কন্যার পিতা মাতা গর্ব প্রকাশ করেন, কেউ কেউ অপ্রগল্‌ভ হয়ে চুপ হয়ে যান এবং কেউ কেউ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে যান। কন্যার হাসি তাদের কাছে মোটেও খুশির কারণ হয়ে ওঠে না। তারা নিরতিশয় দুঃখিত হন। আমি প্রথমে যে তরুণ ইঞ্জিনীয়ারটির প্রসঙ্গ দিয়ে কথা শুরু করেছিলাম এবং তার প্রথম চাকরিতে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে বাড়ির এবং জন্মস্থানের জন্য তার মনে কোনো বিশেষ স্থান নেই দেখে অবাক হয়েছিলেন, সেই ছেলেটির সঙ্গে সদ্য বিবাহিত ও প্রকট আনন্দে স্বামীগৃহে গমনোদ্যত কন্যাটির মনোভাবের আশ্চর্যরকম মিল সকলেই দেখতে পাবেন। মিলটি হচ্ছে এদের মনের আবেগরহিত অবস্থা। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই কম-বেশি আবেগ থাকে। এই আবেগের অনেকটাই দুর্বলতাপ্রসূত। পক্ষিশাবক আকুল আগ্রহে মায়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। মা খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসে হা-করা মুখগুলিতে সেই খাদ্য ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু পক্ষিবিদরাও জানেন সাধারণ মানুষও দেখেন যে পক্ষিশাবক একবার উড়তে শিখলে আর ফিরতে জানে না। চলে যায়। পশুদের অবস্থাও তাই। স্তন্যপানের বয়স পার হয়ে গেলেই চলে যায় তারা। পশু ও পাখিদের মধ্যে প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের ক্ষণস্থায়ী প্রণয়লীলা চলে। পাখিরা একত্রে বাসাও বাঁধে। কিন্তু পরেই ভুলে যায় একে অপরকে। বহু কাল ধরে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে চীনের মান্দারিন হংস-হংসী আজীবন দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ইদানীং গবেষণা করে দেখা গেছে যে এই ধারণা নেহাৎই ভ্রমাত্মক ও কবিসুলভ কল্পনা মাত্র। মান্দারিন হংস ও হংসীরা অন্যান্য বিহঙ্গমের তুলনায় মোটেই পশ্চাৎপদ নয়। তারাও 'ঋতুতে ঋতুতে চঞ্চল গতিতে হন্যে হয়ে প্রণয়ীর জন্যে ছলাকলা যত করে প্রদর্শিত। পেয়ে যেই যায় উন্মত্তের' প্রায় মেটায় লালসা·দেহের তৃষ্ণা যথাসাধ্যমত কাল হয় গত। তারপর আর প্রয়োজন কার, চলে যায় তারা কাজ হলে সারা, যার যার মত হয়ে যায় স্থিত।

পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার মধ্যে মানুষের মত এমন অসহায় করে আর কাউকে তৈরি করা হয়নি। তার শিং নেই, নখ নেই। দাঁত যা আছে তা দিয়ে অন্যকে কামড়ে আহত কবার মত ধার নেই। মুখের গড়নও কামড়াবার পক্ষে অনুপযুক্ত। মানুষের উড়বার জন্য পাখা নেই, গাছে চড়ার তেমন ক্ষমতা নেই। গায়ে লোমের চাদর নেই। সুতরাং যে কোন জীবের চেয়ে দীর্ঘতর সময় মানব শিশু পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে। মানুষের মস্তিষ্ক উন্নত প্রকৃতির, তার স্মরণ শক্তি ও ভবিষ্যৎ দর্শন শক্তি আছে। সুতরাং মানবশিশুর দীর্ঘকাল মাতার সঙ্গে অবস্থান পরিচয়কে স্থায়ী

করে তোলে। সে ঠেকে শিখেছে যে মানুষের পক্ষে একা বাস করা অসম্ভব। যূথবদ্ধতা আবশ্যিক। কালক্রমে গোষ্ঠী, সমাজ, দেশ, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ইত্যাদির ধারণা জন্মায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনও সংযোজিত হয়। নর-নারীর প্রেম, বিবাহের পবিত্রতা, পিতৃমাতৃভক্তি, জন্মস্থান ও দেশের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এইসব গড়ে উঠেছিল হাজার হাজার বছর ধরে। দেশ ও দেশভক্তির ধারণটা অবশ্য সর্বাধুনিক। আগে ছিল রাজভক্তি। রাজার বাহু, সৈন্য ও কৌশল বলের তারতম্যে দেশের সীমা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হত। তাতে প্রজা সাধারণের বিশেষ লাভ বা লোকসান ছিল না।

ইদানীং মানুষের মধ্যে আবেগপ্রধান মানসিকতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকায় এই ধারণা আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। এখন আমাদের দেশেও হচ্ছে। এর কারণ বহুবিধ। প্রধান কারণ সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন। বহু ইউরোপীয় দেশে পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তান। সুতরাং অন্য সন্তানরা পিতামাতার প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করে না। কম্যুনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়ায় তো বাড়ি ছাড়া কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তিই ছিল না। তাই সকল সন্তানের উত্তরাধিকারের প্রশ্নই নেই। বর্তমান ভারতে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। সম্পত্তি যত ক্ষুদ্র হোক পুত্র কন্যা স্ত্রী সকলে সমান উত্তরাধিকারী। ভাগের ভাগ তস্য ভাগ। এর জন্য অনেকেই লালায়িত হয় না। অতএব পিতা মাতার প্রতি আকর্ষণ থাকে না। দ্বিতীয় কারণটাও অর্থনৈতিক, তবে গৌণভাবে। শিশু অবস্থা থেকেই পিতামাতা সন্তানকে সবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার দৌড়ে এমন ত্রস্ত করে রাখেন যে শিশুর মধ্যে আবেগ নামক অনভিপ্রেত বস্তুটি জন্মাবারই সুযোগ পায় না। মা-বাবার স্নেহ, খেলাধূলায় সমবয়সীর সান্নিধ্য, ব্রত-পূজা ইত্যাদিতে নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়, এসব কিছুই নেই তার জীবনে। ছেলেরা রামায়ণ মহাভারত জানে না; সুভাষচন্দ্র শ্যামাপ্রসাদদের নাম শোনেনি, বাউল, যাত্রা, কবিগান, কীর্তন এগুলি খায় না মাথায় দেয় জানে না। সুতরাং এদের মা বাবার প্রতি, জন্মস্থানের প্রতি, নিজের দেশের প্রতি কোন বিশেষ আকর্ষণবোধ থাকে না। এরা বড় হয়ে মধ্যপ্রদেশে চাকুরী করতে যাবার সময় মা বাবা বা জন্মস্থান আগরতলার জন্য কোন প্রাণের টান অনুভব করে না। এই সব মেয়েদের বিয়ে হলে হাসতে হাসতে বরের গাড়িতে ওঠে। যে ভাবে দেশ সভ্য হয়ে উঠছে তাতে অচিরেই পাশ্চাত্যের মত আমাদের দেশের মানুষও জামা-কাপড় পাল্টানোর মত স্বামী-স্ত্রীও পাল্টাবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে 'চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম' অর্থাৎ 'আগে ঘর, পরে তো পর।' যে প্রজন্মে মানুষের মধ্যে নিজের বাবা, মা, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি কোন বিশেষ আকর্ষণ নেই, যে প্রজন্মে মানুষের আবেগের উৎস শুকিয়ে গেছে, যখন

মানুষের কাছে অর্থই পরমার্থ হয়ে উঠেছে, যে সময়ে আগরতলার ছেলে মধ্যপ্রদেশে, ভারতের ছেলে বিদেশে বা নবোঢ়া কন্যা বরের বাড়িতে যাওয়ার সময় পেছন দিকে তাকিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে না, এবং যারা ফেলে তাদেরকে স্টুপিড ও সেন্টিমেন্টাল ফুল বলে, সেই প্রজন্মের কাছে ১৫ই আগস্ট বা স্বাধীনতা দিবসের মূল্য কি ? কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ? স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে যারা জন্মেছে তারা সকলেই দেশপ্রেমিক ছিল, সে কথা বলছি না। তাদের মধ্যে অনেকেই পুলিশ ছিল, ইনফর্মার ছিল, ব্রিটিশভক্তও ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যাদের জন্ম, যারা জীবনের ইঁদুর দৌড়ে পর্যুদস্ত, যারা পরাধীনতার অভিশাপ ভোগেনি, যাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্নতর, রাজনীতির কর্দমে যারা বীতশ্রদ্ধ, তাদের কাছে পনেরেই আগস্ট কি বাণী বহন করে আনে? কিছুই না। শুধু রবিবার না হলে একটা সবেতন ছুটি পাওয়া যায়।

তবু পনেরোই আগস্ট আসে। নেতারা বাণী দেন। কেউ কেউ ঐ দিন প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন। অনেকে সারাদিন ঘুমান, কেউ হয়তো বনভোজনের আয়োজন করেন। পত্র-পত্রিকায় ক্রোড়পত্র বেরোয়। আমরা যারা ব্রিটিশদের প্রজা হয়ে জন্মেছিলাম তারা আবার সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি স্মরণ করি। সুযোগ পেলে ছোটদের কাছে এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করি। পতাকা ওড়ে, কুচকাওয়াজ হয়। আবার রাস্তায় বন্দুকের মুখে গাড়ি থামে, যাত্রীরা লুণ্ঠিত, প্রহৃত, অপহৃত বা নিহত হয়। বিদেশী শত্রু বহু রক্তের মূল্যে বিতাড়িত হয়েছিল। এখন ঘরে ভাই ভাইয়ের শত্রু। এবার কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো? স্বাধীনতা এখন চরম বিপদগ্রস্ত। কিন্তু কার হাতে বিপদগ্রস্ত? ইংরাজকে চেনা সহজ ছিল। এখনকার শত্রু হয় আমি, নয় আমার ভাই। এখন কি হবে? দেশের প্রতি ভালবাসা এখন বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ। আবেগ এখন মূর্খামি। হায় পনেরোই আগস্ট। আমি যে পুরানো দিনের। আমি তোমাকে নমস্কার করি।

(স্যন্দন পত্রিকা, ১৫ আগস্ট ১৯৯৫)

কর্তব্য ও আমরা

আজকের এই পৃথিবীতে আমি একটি উন্নতিশীল দেশের নাগরিক। আমার চতুষ্পার্শ্বে দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, অশিক্ষা, রোগ ও মৃত্যুর বিজয় উল্লাস প্রকট। আমার দেশের এই দীন অবস্থার জন্য আমি নিজেই অনেকাংশে দায়ী। আমি চরিত্রে কর্মবিমুখ, প্রবঞ্চক ও ধূর্ত। আমি আমার কর্তব্য কাজ করি না। সহকর্মীকেও কাজ না করার ব্যাপারে উৎসাহ জুগিয়ে দল গড়ি এবং মালিকের কাছে আরো বেশি বেতন ও সুযোগ সুবিধা দাবি করি। মালিক বুঝতে পারে যে আমার ক্ষমতা আছে তার কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার। সুতরাং কারখানা বন্ধ হওয়ার ভয়ে সে প্রথম প্রথম দাবি দাওয়া মেনে নেয় এবং আমার অহঙ্কার আরো বাড়ে। আমার বর্ধমান অহঙ্কারের আড়ালে মালিক তার ভবিষ্যৎ গোছায় এবং কারখানার সর্বনাশ করতে থাকে। একদিন কারখানা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মালিক বেপাত্তা হয়, দুই চারজন আত্মহত্যা করে এবং আমি ও আমার অনুগামীরা অনিশ্চিতকালের জন্য উপবাসী ভিক্ষুকে পরিণত হই। নেতা ছিলাম বলে আমিও গুছিয়েছিলাম। সুতরাং আমার কিছুদিন দু'মুঠো জোটে অন্যদের তৎক্ষণাৎই দুর্দশা আরম্ভ হয়।

আমার পুরো জাতটারই এই অবস্থা। আমরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে দেশের ও নিজেদের সর্বনাশ করাতে বদ্ধপরিকর হয়ে আছি। পশ্চিমের বড় ধনাঢ্য দেশগুলি আমাদের দেশকে দরিদ্র ও হীনবল রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রতিবেশীদের মধ্যে শত্রুতা মিটাতে দিচ্ছে না এবং আমাদের মূল্যবান জাতীয় সম্পদের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র আমদানী করতে বাধ্য করছে। দেশের অভ্যন্তরে দলবাদ, গোষ্ঠীবাদ, স্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদির নামে চরম হিংসা ও ঘৃণা সৃষ্টি করছে এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। দেশের ও রাজ্যের সরকারগুলি দেশের বিকাশের কাজ স্থগিত রেখে সন্ত্রাস দমনে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলি চুটিয়ে ব্যবসা করছে। আমার দেশের তরুণ সমাজ বাধ্য হয়ে ঐসব সংস্থায় মোটা বেতনে কাজ করে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উৎপাদনে সক্রিয় সাহায্য করছে। বিভিন্ন কারণে আইনসঙ্গতভাবে দেশের সরকারের পুরো দায়িত্ব অক্ষম, অযোগ্য, অপরিণামদর্শী প্রজন্মের হাতে পড়ে, বিদেশীদের আহ্লাদের কারণ হয়ে উঠছে। সর্বনাশা নেশায় যুব সমাজের একাংশ নিশ্চিতভাবে পঙ্গু হয়ে সমাজের কাছে পরগাছা

হয়ে পড়ছে। দেখেশুনে মনে হয় এই দেশটার সর্বনাশ অনিবার্য এবং সেই সর্বনাশ হওয়ার সময়ও বেশি দূরে নেই।

কিন্তু এই প্রবন্ধ যে মুষ্টিমেয় ক'জন ধৈর্য ধরে পাঠ করবেন তারা সকলেই জানেন যে বর্তমান পৃথিবীতে অনেক দেশেরই অবস্থা ঈর্ষণীয় নয়। রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদ্রোহে লিপ্ত বিভিন্ন দেশের জনগণ। সারাটা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। মানুষ মানুষকে নির্বাচারে হত্যা করছে। কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ মানুষকে ধীর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর্ত, ক্ষুধার্ত, পীড়িত, আশ্রয়হীন মানুষের কাছে সেবা, খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয় প্রস্তুত সামগ্রী পাঠালে তা পৌঁছাতে দিচ্ছে না। পথে লুঠ করে নিচ্ছে অথবা নষ্ট করে দিচ্ছে। সুতরাং ভারতবাসী হিসাবে আমার এতটা হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই। যদি মনে করি ভারতের সর্বনাশ অনিবার্য, তাহলে সেই মনে করাটা হবে সম্যক দৃষ্টির অভাবজনিত। বস্তুতঃপক্ষে ভারতের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হলেও পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় যথেষ্ট ভাল। ভারত সন্তানেরা দেশে ও বিদেশে বহু স্থানে বিজ্ঞানে, চিকিৎসায়, কারিগরীতে, ব্যবসায়ে, শিক্ষাদানে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন। অনাবাসী ভারতীয় এই দেশের উন্নতিতে নিজেদের উপার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করে সাহায্য করছেন। ভারতের অভ্যন্তরেও শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, শিক্ষার হার বেড়েছে, আরো বেশি সংখ্যায় লোক সুস্থ জীবন যাপন করছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, না খেয়ে মৃত্যু কমছে, মহামারী হচ্ছে না।

কিন্তু আমাদের আশা ছিল অনেক। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেলে আমরা অতি দ্রুত উন্নতি করবো, আমাদেরকে কেউ রুখতে পারবে না। স্বাধীন ভারতে অশিক্ষা, বুভুক্ষা থাকবে না। মোট কথা, কাব্য করে বলতে গেলে আমরা ভাবতাম, 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।' কিন্তু সে আশা আমাদের আর ফলবতী হল না। অবস্থা যা, তাতে আমাদের সে আশা ফলবতী হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই আছে বলে মনে হয় না। আমাদের আশা ফলবতী না হওয়াতেই আমরা নিরাশ হয়ে পড়েছি। এর কারণ কী? কী কারণে ভারতের আজ এই অবস্থা? কেনই বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এখন দুর্দশার যুগ চলছে? আমরা অতি সংক্ষেপে একটু আত্মসমীক্ষা করে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করতে পারি।

আমি যে শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা করি, সেখানে শিক্ষকদের বসবার জন্য একটা ঘর নির্দিষ্ট আছে। সেখানে যে সমস্ত কথাবার্তা হয়, আলাপ-আলোচনা চলে, সেগুলি আমি প্রায়শঃই বহিরাগত একজন তৃতীয়পক্ষ শ্রোতা হিসাবে শোনার চেষ্টা করি এবং কোন পক্ষাবলম্বন না করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। কাজটা কঠিন। সব সময় যে পারি তাও নয়। তবে অনেক চেষ্টা করবার ফলে কিছু পারি। জানেন, আমার ঐ শিক্ষক সহকর্মী বন্ধুরা আজকাল কদাচিৎ শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা করেন। কিছুকাল

আগে আমাদের বসার ঘরটি রাজনৈতিক আলোচনার স্কুল হয়ে উঠেছিল। ইদানীং রাজনীতিও নির্বাসিত। ইদানীং অত্যন্ত নিম্নমানের ব্যক্তিগত চরিত্র-নিধনের আলোচনাই বেশি হয়। অথচ এই ঘরটিতে ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ ডিগ্রীধারীরা বসেন। লোক এখানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হবে বলে আশা করেন। আমার এই প্রবন্ধে শিক্ষকদের সম্বন্ধে আলোচনা মুখ্য নয়, গৌণ। আমরা সকলেই জানি যে জীবদেহে পচন ধরলে প্রথমে মাথাটা পচে। সমাজদেহে শিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়কে মাথা বলতে পারি। পচন সেখানেই ধরেছে। শিক্ষিত সমাজে উচ্চ চিন্তার অভাব সমাজের মস্তিষ্কে পক্ষাঘাতের লক্ষণ। মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে পরিণাম কেমন যন্ত্রণাদায়ক হয় তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা আমাদের প্রিয় কবি নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে। প্রিয় কবি আমাদের যত প্রিয় বা যত শ্রদ্ধার মানুষ হোন না কেন তিনি একজন ব্যক্তি মাত্র। তার অসহায় অবস্থায় সমাজ ও জাতির জীবনে আঘাত হানে কম। কিন্তু যখন পুরো সমাজটাই এই রোগে আক্রান্ত হয় তখন? আমাদের এখন সেই অবস্থা চলছে।

পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই এই ভেবে মুচকি হাসছেন যে আজকাল এই দেশটায় দুটো জিনিস খুব নজরে পড়ছে। একটা চোখের নজরে আরেকটা কানের নজরে। চোখের নজরে পড়ছে কি অবলীলায় এদেশে মানুষ কাজে অবহেলা করে যাচ্ছে। কানের নজরে পড়ছে কেমন স্বচ্ছন্দে মানুষ এই কর্মবিমুখতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আপনি অসঙ্কোচে এই লেখাটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস হিসাবে গণ্য করতে পারেন। যদি করেন তাহলে আপনার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ব্যঙ্গাত্মক মুচকি হাসি দেখা দিলে তা অস্বাভাবিক হবে না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বলছি।

অনেকদিন আগের কথা। এখন পোস্ট-অফিসের জন্য যে বড়সড় বাড়িটা তৈরি হচ্ছে আগরতলায়, তখন এই জায়গাতেই একটা বেশ ছোটখাটো বারান্দাওলা একতলা বাড়ি ছিল। সেটাই ছিল আমাদের 'বড়' পোস্ট-অফিস। বোধ হয় ১৯৬৮ সালের শেষের দিকের কথা। দশটা বেজে গেছে। মনি অর্ডার করার জন্য 'কিউ'-এ দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে আছেন জনাচারেক আর পেছনে দু'জন লোক। কুল্লে আমরা সাতজন। এর মধ্যে চতুর্থ জন, অর্থাৎ আমার ঠিক সামনেই দাঁড়ানো লোকটি অনবরত গালাগালি করে যাচ্ছেন চেয়ারে—এখনো আসেননি কেরানীবাবুকে। যাক্‌গে দশটা কুড়ি নাগাদ তিনি এলেন এবং বসলেন। এবার তাকে ঐ লোকটি জিজ্ঞেস করলেন ক'টা বাজে, এত দেরিতে কেন, ইত্যাদি। বাবুটি ড্রয়ার খুললেন, একটা ন্যাকড়া বার করে টেবিল মুছলেন এবং উঠে চলে গেলেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফিরে এলেন। বলা বাহুল্য, উত্তেজিত কিউয়ে চতুর্থ স্থানে দাঁড়ানো ব্যক্তিটির বাক্যবাণ অব্যাহত গতিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মনি-অর্ডার বাবু নির্বিকার। তিনজনের মনি-অর্ডার হয়ে গেল। চতুর্থজন তাঁর ফর্ম ও টাকা দিলেন। এবার সেই নির্বিকার নির্লিপ্ত বাবুটি কথা বললেন। তিনি বললেন, 'আপনি সেক্রেটারীয়েটে কাজ করেন তো?

মনি-অর্ডার করে তবে অফিসে যাবেন তো? আপনার অফিসে আপনাকে কেউ ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করে না তো? পোস্ট-অফিসে এলেই লোকের সময়জ্ঞান খুব বেড়ে যায়। সকলেই যদি নিজেদের অফিসেও সময়ের কথাটা মনে রাখতো তাহলে ভাল হতো।'

এই চিত্র সর্বত্র। আমাদের শিক্ষকদের একটা সমিতি আছে। মাঝে মাঝে সমিতির সভা টভাও হয়। যখন সভা হবে বলে সময় দেওয়া থাকে তার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পরে সভা আরম্ভ করতে হয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতির অভাবে। যাঁরা দেরিতে আসেন তারা এসেই তম্বি করতে থাকেন এখনও সভা শুরু হয়নি! দু'একজন নেতা গোছের সদস্য ছিলেন যারা এসেই এলোপাথারি বক্তৃতা শুরু করতেন। যখন বলা হত যে এসব অবান্তর, তখন তাদেরকে আবার গোড়া থেকে সভায় কী কী আলোচনা হয়েছে তা শোনাতে হত। দেরিতে আসার জন্য তাদের কোন লজ্জা হচ্ছে এমনটা কোনোদিন দেখিনি। বরং এজন্য তারা বাড়তি সুযোগ পেতেন।

বিবিসি প্রচারিত 'ইয়েস মিনিস্টার' নামক চিত্র-শৃঙ্খলটি দেখেছেন? অনবদ্য ঐ মন্ত্রীবরের চরিত্রে যতগুলি ত্রুটি আছে তার সবগুলিই আছে আমাদের অধিকাংশ (গৌরবে) মন্ত্রী, নেতা, আমলা, কর্মচারী ও জনতায়। গুণগুলি নেই। তিনটায় কোথাও বি-রা-ট জনসভা হবে এবং মাননীয় অমুক বক্তৃতা করবেন বলে সমাইক গর্জনা হল। যদি আপনি সোজা সভায় না গিয়ে ঐ মাননীয় নেতার বাড়িতে চলে যান তবে দেখবেন সভা সম্বন্ধে তিনি একেবারেই উদাসীন। ঘণ্টাখানেক পরে যদি তিনি তৈরি হতে শুরু করেন তাহলে ভাগ্য ভাল বলতে হবে। অনেক সময় তিনটার সভায় চারটের সময় তেলিয়ামুড়া থেকে খবর আসে যে তিনি রওয়ানা হচ্ছেন। অবিলম্বেই এসে পড়বেন।

আমার স্নেহভাজন এক সহকর্মী একটি সুন্দর প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন তিনি সভা-সমিতিতে আহুত অনাহুত রবাহুত হয়ে যাবেন। দেখবেন সভাটা কতটা দেরিতে শুরু হয়। লক্ষ্য করবেন সভাটা কার জন্য দেরিতে শুরু হল। সভা শেষে তিনি বিলম্বের জন্য দায়ী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করবেন—

আজ সভায় আসতে আপনার দেরি হল কেন?

ভবিষ্যতে আপনি কি চেষ্টা করবেন সভায় সময়মত যেতে?

আপনি কি আপনার কর্মক্ষেত্রে সময়মত যান?

যদি না যান, তাহলে এবার থেকে যেতে চেষ্টা করবেন কি?

অনুজপ্রবর আমাকে কথাগুলি বলছিলেন বেলা তিনটা দশে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে তিনটায় সভা আরম্ভ হওয়ার কথা। এই সেদিন। পঁচানব্বই-এর জানুয়ারী মাসে। জায়গাটায় সারি সারি চেয়ার। উদ্যোক্তারা জনা বারো ছড়িয়ে ছিটিয়ে। শ্রোতা আমরা দুজন মাত্র। সভার অলঙ্কার মন্ত্রী অতিথিবর্গ ও সভাপতি তথা অন্যান্য বুদ্ধিমান নিমন্ত্রিত শ্রোতৃবৃন্দ অনুপস্থিত। স্বভাবতঃই স্নেহাস্পদ অনুজপ্রবরের

প্রকল্প বিষয়ে খুব উৎসাহিত বোধ করলাম। ধীরে ধীরে মন্ত্রীসহ সকলেই এলেন। সভা তিনটা পঁয়ত্রিশে শুরু হল। সভাপতির আসন শূন্য রেখেই। ওই আসনে সভাপতি এসে বসলেন চারটেয়। সভা শেষে সভাপতি বক্তৃতাও করলেন এবং আমাদের আকাশবাণীর মতই তিনি বিলম্বের জন্য দুঃখিত হলেন না। আমি আমার সেই উৎসাহী প্রকল্পকারকে ধরলাম সভাপতিকে প্রশ্ন করতে। তিনি আমাকে টানতে টানতে সেখান থেকে নিয়ে বাইরে চলে এলেন এবং বললেন যে তিনি তার প্রকল্প পরিত্যাগ করছেন। অর্থাৎ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ঐ সভাপতি মহাশয়কে এখন প্রশ্ন করার সাহস তার নেই।

এই হল আমাদের বর্তমান অবস্থা। কাজের প্রতি অবহেলা, সময়ের প্রতি অবহেলা এখন একটি সর্বগ্রাসী ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বেকারী, দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ইত্যাদির মূল অনুসন্ধান করলেও দেখা যাবে যে এই ব্যাধিটিই এসবের আসল কারণ। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজের ত্রুটির সাফাইস্বরূপ অন্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া। কাউকে তার ত্রুটি দেখালেই তিনি অন্যের ত্রুটিটি যে আরো বড় তা দেখিয়ে দেন। রাস্তায় রিক্‌শা দাঁড় করিয়ে রাখলে তাকে কিছু বললেই সে অদূরে দাঁড়ানো ট্রাকটি দেখিয়ে দেয়। নিম্নশ্রেণীর কোন কর্মী দেরিতে এসেছে বললে সে উচ্চশ্রেণীর কর্মী যে তখনো আসেনি তা দেখায়। কোনও রাজ্য সরকারকে ত্রুটি দেখালে সেই সরকার অন্য রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ যে আরও বেশি তা বলে। কোন শিক্ষায়তনে ছাত্র পরীক্ষায় অসদুপায় গ্রহণ করলে তাকে ধরলে সে অন্য শিক্ষায়তনে যে এসব অবাধে চলছে এবং তার ফলে তারা ভাল ফল করছে তা বলে। সুতরাং....

সুতরাং আমাদের মন খারাপ। দেশের ভবিষ্যৎ ও প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ভেবে আমাদের উদ্বেগ বর্ধমান। সবার ওপরে এই ব্যাপারে রাজনীতিবিদ্‌দের অসহায় অবস্থার কথা আমাদের উদ্বেগ বাড়ায়। এরা সকলেই বিষয়টি জানেন এবং এর প্রতিবিধান করতেও আগ্রহী। কিন্তু যেহেতু তাদের ভাগ্য ভোটের উপর নির্ভরশীল তাই তারা এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সাহস পান না। সুতরাং এই কর্মবিমুখতা অব্যাহত গতিতে চলছে।

অতএব প্রয়োজন এর পরিবর্তন। প্রথমেই প্রয়োজন নিজের দোষ ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্যের দোষ দেখানোর প্রবণতা বন্ধ করা। সর্বত্র দেখা প্রয়োজন কর্মচারিবৃন্দ সময়মত এলেন কিনা, কাজ করছেন কিনা। এই ব্যাপারে সার্কুলার জারী করে যে কোনও লাভ হয় না একথা যত তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারবেন ততই মঙ্গল। সকলকেই নিজের কাজটুকু করার কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। আমাদের আশা সর্বজনীন প্রচেষ্টা চালালে ধীরে ধীরে আমাদের বিবেক জাগ্রত হবে। যারা এই দোষে দোষী তারা যখন নিজের নিজের ত্রুটির জন্য লজ্জিত বোধ করবেন তখনই ফিরে আসবে স্বাভাবিক অবস্থা।

(*স্যন্দন পত্রিকা,* ১৫ *আগস্ট* ১৯৯৫)

অধ্যাত্ম বন্দনা

ভারতবর্ষ ঃ এত অশান্তি কেন?

বর্তমান ভারত এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে। সাম্প্রদায়িকতা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে। দিকে দিকে হিংসার আগুন জ্বলছে। মরছে মানুষ, জ্বলছে বাড়িঘর। ভস্ম হয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি। সুযোগ বুঝে সমাজদ্রোহী যত অসুর নিজের নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। ধর্মীয় বিরোধের আড়ালে সুযোগ-সন্ধানীর দল ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটিয়ে নিচ্ছে, আঞ্চলিকতাবাদ তার স্বার্থ বুঝে নিচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলি তাদের পথের কাঁটা সরাচ্ছে। চারদিকে কেবলই অন্ধকার। কবে আবার চেতনার সূর্য উঠবে, শান্তির ফুল ফুটবে, স্বস্তির বায়ু বইবে আমরা কেউ জানি না। অসুর শক্তি চরম দাপটে সমস্ত গ্রাস করে বসে আছে।

বস্তুত পক্ষে দেশ বিভাগে রাজী হয়ে তৎকালীন নেতৃবর্গ দেশের জন্য একটি স্থায়ী অশান্তির বীজ রোপণ করে গেছেন। সেই সময়ে তাঁরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাতে দেশ বিভাগ ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো গ্রহণযোগ্য পথ ছিল না। সেই সম্বন্ধে বিতর্ক আনার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি না, তার সময়ও এখন নয়, এবং ঐ রকম কোনো বিতর্ক করে কোনো লাভও নেই। যা হয়ে গেছে তা ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। তবে এ কথা মানতেই হবে যে বিবাদ-বিসম্বাদ ও হিংসা হানাহানির বিষ-বীজটি সেই সময়ে রোপণ করা হয়েছিল।

এক সাহেব—ভিনসেন্ট স্মিথ—লিখে গেছেন যে ভারতবর্ষে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' দেখা যায়। আমার বয়সী লোকেরা কতবার এই কথা শুনেছি, পড়েছি এবং লিখেছি তার হিসেব নেই। বার বার শুনে লিখে পড়ে আমাদের ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে সত্যিই দেশটা বিচিত্র। এর মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় সেটা নেহাতই আশ্চর্য এবং সেই ঐক্য স্বভাবতই অত্যন্ত ভঙ্গুর। বিশেষ যত্ন না নিলে সেই ঐক্য যে কোন সময়ে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ফলে যখনই দিগন্ত ব্যাপী অশান্তির কালো মেঘ দেখা দেয়, যখনই হিংসার ঝড় ওঠে, পরিত্রাহী চিৎকারের বিজলী চমকায়, বাজ পড়ে, আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বারংবার বলতে থাকি 'দেশটা গেল, দেশটা গেল'।

আসলে তা ঠিক নয়। সাহেবরা বললেই সব কথা ঠিক হয়ে যায় না। স্মিথ বলতে পারতেন যে দেশটায় ঐক্যের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। কোন দেশে নেই। ইংরেজদের দেশটা একেবারেই ছোট—পকেট সাইজ। কিন্তু তার মধ্যেও ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ডে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। ইংল্যান্ডের মধ্যেই ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্-এ ভাষা, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য পাহাড় প্রমাণ। চীন, রাশিয়া ও ব্রাজিল-এর মত বিশাল দেশগুলিতে বৈচিত্র্যের সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু কোন ভিনসেন্ট স্মিথ তাদের দেশের ইতিহাস লেখেননি। সুতরাং এই সব বৈচিত্র্যের কথাও কেউ বলেননি।

স্বাধীনতার পরে এই দেশে বার বার আমরা ভ্রাতৃদ্রোহী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছি। কখনো ধর্মের নামে, কখনো ভাষার নামে, কখনো নৃতাত্ত্বিক উৎসের নামে আমরা পরস্পরকে হত্যা করেছি। রাজনৈতিক দলের নামে দুই-দশ জনের হত্যা তো আকছার হচ্ছে। লোকে এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামানোই ছেড়ে দিয়েছে। এখন এই দেশটাতে আর মানুষ নেই। যখন কোন মানুষ খুন হয় তখন পত্রিকায় তাকে মানুষ বা লোক হিসাবে লেখা হয় না। সে হয়ে যায় তফসিলভুক্ত জাতি বা উপজাতির অথবা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সদস্য। যদি কোন নারী ধর্ষিতা হয় তবে তার নারীত্ব গৌণ হয়ে গিয়ে সে কোন জাতের বা ধর্মের বা রাজনৈতিক দলের তা ফলাও করে প্রচারিত হয়। প্রচারের এই যে নতুন ভাষা তাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সংবাদ-মাধ্যমগুলির নিয়ন্তারা জ্ঞাতসারেই সাধারণ মানুষকে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠতে প্ররোচিত করেছেন। সুতরাং যারা আগুন লাগাচ্ছেন, যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে মাথা কাটছেন বা বক্তৃতা দিয়ে নিজের দলের মানুষদেরকে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন তাদের চেয়ে যারা কলম দিয়ে উত্তেজনার আগুন নাড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের দায়িত্ব মোটেই কম নয়। তবে এই দুর্ভাগা দেশে কেবল প্রত্যক্ষ খুনীরাই দোষী হন অপ্রত্যক্ষরা মানী লোক—রাজনৈতিক নেতা হলে তো কথাই নেই, সম্পাদক বা পত্রকার হলেও তারা সমান গুণী ও মানী।

এই অশান্তির কারণ অনেক। একটা কারণের কথা আগে বলেছি। তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পাওয়ার আগ্রহের আতিশয্যে দেশটাকে ব্যবচ্ছেদ করায় রাজী হয়েছিলেন আমাদের নেতৃবৃন্দ। পরে ১৯৬৯-৭১ সালে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ধর্ম যদি বা অনৈক্যের কারণ হতে পারে, তার সুনিশ্চিত ঐক্যের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নেই। পাকিস্থানী মুসলমান সেনার বাংলাদেশের মুসলমান মা-বোনের উপর অত্যাচার করতে একটুও বাধেনি। ফলে ভারত নামক দেশটা ধর্মের নামে বিভক্ত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে, আর পাকিস্তান নামক দেশটা খণ্ডিত হয়ে গেল ভাষার নামে ১৯৭১ সালে। পাঞ্জাব অঞ্চলে মুসলমান শাসনকর্তার হাতে শিখরা অত্যাচারিত হয়েছে শত শত বছর ধরে। ১৯৪৭ সালের ভয়াবহ নরমেধ যজ্ঞের চিত্র চিরস্থায়ী করে রেখেছেন খুশওয়ান্ত সিং তাঁর 'ট্রেন টু পাকিস্তান' উপন্যাসে। কিন্তু গত ক'বছর ধরে কিছু

বিপথগামী শিখ যুবক পাকিস্তানের মুসলমানকেই তাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করে আসছে এবং তাদের সাহায্যে দেশের সর্বনাশ করছে। সুতরাং ধর্ম ঐক্য বা অনৈক্যের কারণ নয়—অজুহাত মাত্র। স্বার্থান্বেষীরা সেই অজুহাতকে সময় মত কাজে লাগায়। ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলে এই দেশটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলেও ভারত একটা বিরাট দেশই রয়ে গেল। এই দেশটায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নবীন খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, কাদিয়ানী ইত্যাদি ধর্মের উপাসকগণ থাকলেও এখানকার সংখ্যাগুরু লোকেরা প্রাচীন সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী ইত্যাদি ধর্মের উপাসক। এদের ইতিহাস দীর্ঘ, সংস্কৃতি প্রাচীন, সহনশীলতা অতুলনীয়। সেই কারণে স্বাধীনতার পরবর্তী চল্লিশ বছরে এই দেশে শিক্ষা, শিল্প, খাদ্য উৎপাদন কারিগরি উৎকর্ষ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তা অকল্পনীয়। মনে রাখতে হবে যে এই সব উন্নতি করতে হয়েছে দেশে গণতন্ত্র বজায় রেখে। গণতন্ত্রের বড় দোষ হল স্বার্থান্বেষী লোভী রাজনৈতিক দলের অবাধ অপপ্রচারের স্বাধীনতা। ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি অকারণ ধর্মঘট ইত্যাদিতে প্ররোচনা দিয়ে দেশের উন্নতিকে ব্যাহত করেছে পদে পদে। শিক্ষা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা থেকে বঞ্চিত মানুষকে অতি সহজে পথে নামানো যায়, নির্বাচনের সময় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা অল্প মূল্যে কেনা যায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অতি কৌশলে দরিদ্রকে দরিদ্র বা দরিদ্রতর রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং বুভুক্ষা, হতাশা এবং অজ্ঞতার পরিবেশে নিজের নেতৃত্ব কায়েম করে রাখছেন। এই দেশে যতটা উন্নতি হয়েছে তার চতুর্গুণ হতে পারতো যদি আমাদের রাজনৈতিক নেতারা আত্মস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বার্থের জন্যও কাজ করতেন।

দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দেশের জনসংখ্যায় লাগামহীন বৃদ্ধিও বহুলাংশে দায়ী। প্রায় প্রত্যেকটি গরীব দেশেই জনসংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। আমাদের দেশেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেকারী, অশিক্ষা, রোগবৃদ্ধি, হিংসা ইত্যাদির আকর। যখনই কঠোরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা হয়েছে তখনই কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী 'গেল গেল' রব তুলেছে? আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ফেলেছে এবং সেই প্রচেষ্টাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য করেছে। এর কারণও সেই একই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেলে কমে যাবে অশিক্ষা, বেকারী, দারিদ্র্য; মানুষ সুখের মুখ দেখতে পাবে; ভোট দেবার আগে বিবেচনা করতে শিখবে, নেতাদের ফাঁকা বুলি বুঝে যাবে এবং নেতৃত্বের স্থায়ী আসন টলায়মান হবে। সুতরাং চলুক লাগামহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, থাকুক নেতৃত্ব, যাক দেশ রসাতলে, আমি মরে গেলে কি হবে তা নিয়ে আমার কি মাথাব্যথা।

গত শ' তিনেক বছর ধরে সাদা চামড়ার লোকেরা কালো, বাদামী ও হলুদের উপর সর্দারী করছে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে তাদের সর্দারী কমছে। সাম্রাজ্যবাদের পতাকা দিকে দিকে নেমে গেছে এবং রঙ-বেরঙের জাতীয় পতাকা

উড়েছে বিভিন্ন দেশে। কিন্তু সাদারা এত সহজে তাদের সম্পত্তি ছেড়ে দেবে কেন? তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের ধাক্কা সামলাতে না পেরে দেশগুলিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐসব দেশকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। হাজার হাজার কোটি ডলার, রুবল, পাউন্ড, মার্ক ইত্যাদি ঋণ দিয়ে তার সুদ নিচ্ছে আর আরাম ও আয়েশ করে খাচ্ছে, দেশে মহাজনী ব্যবসা উঠে গেছে কিন্তু আন্তর্দেশীয় মহাজনী ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ঐ সাদারা নিত্য নতুন মারণাস্ত্র তৈরি করছে এবং নতুন স্বাধীন হওয়া দেশগুলির কাছে বিক্রি করছে ও তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। পাকিস্তান যে মাঝে মাঝেই যুদ্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে, ইরাক ইরান যে হম্বি তম্বি করছে, ইরাক যে কুয়েত দখল করছে— এসব ঐ সাদাদের কলকাঠি নাড়ার ফল—তা আজ প্রায় সকলেই জানেন ও বোঝেন।

ভারতের মত কোন দেশ যদি অর্থে ও সামর্থ্যে বড় হয়ে ওঠার চেষ্টা করে তাহলে স্বভাবতই সাদাদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের মত একটা দেশের বাজার নষ্ট হয়ে গেলে ওদের সর্বনাশ। সুতরাং বিভিন্ন ভাবে ওরা এসব দেশকে শোষণ করে এবং শোষণ করার পদ্ধতি কায়েম করার নীতি অনুসরণ করে। একটা পথ অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতমূলক প্রচার। দেশে তৈরি সাবান, টুথপেস্ট, সেফটিপিন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জিনিসই মন্দ এবং বিদেশী সব জিনিসই ভাল এই প্রচারে তারা বাজিমাত করে দিয়ে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করে রাখছে। দ্বিতীয় পথ রাজনৈতিক অপপ্রচার। কেন্দ্র বা রাজ্যে যে দলেরই সরকার থাকুক তার সমস্ত ভাল কাজকে লুকিয়ে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যা প্রচার। ফলে একটা সন্ত্রস্ত অশান্তি বিরাজ করবে, অধিষ্ঠিত সরকার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ থাকবে সর্বক্ষণ এবং উন্নতির কার্য হবে ব্যাহত। তৃতীয় পথ সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা। সন্ত্রাসবাদীদল তৈরি করে তাদের দিয়ে সন্ত্রাসবাদ চালায় বকলমে ঐ সাদারা। পাকিস্তান কিছু বিপথগামী শিখ তরুণকে ট্রেনিং দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদে। কিন্তু পাকিস্তান যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রী আছে পিছনে। পঞ্চম পথ ড্রাগ। এই সর্বনাশা নেশা খাইয়ে দেশের ভবিষৎ নষ্ট করে দিচ্ছে ওরা। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সরকার কাজ করতে পারে না। দেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অর্থ চলে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদ দমনে। যুবশক্তি বুঁদ হয়ে যাচ্ছে নেশায়। সুতরাং......।

সুতরাং দাঙ্গা বাঁধে। যারা বাঁধায় তারা ঐ বিদেশীদের দালাল। মীরজাফর, বিভীষণ, কুইসলিং। যাঁরা দাঙ্গা করে তারা যন্ত্র। হয় অশিক্ষিত দরিদ্র, নয় ড্রাগের নেশায় বুদ্ধিহত। যে মুসলমান দাঙ্গা করে সে নামাজ রোজা হজ জাকাত-এর ধার ধারে না। সে স্কচ, হুইস্কী খায়, মেয়ে মানুষের ব্যবসা করে। যে হিন্দু দাঙ্গা করে তারও ধর্মের তোয়াক্কা নেই। সেও সমান বিপথগামী।

সুতরাং এই দুর্ভাগা দেশের সব দিকেই বিপত্তি। রাজনীতির দাদারা ভোটের বাক্সের কথা স্মরণ রেখে কথা বলেন। আজকাল রাজনীতিতে বেশ কিছু এমন লোকও এসে গেছেন যাদের কোন যোগ্যতাই নেই। দেশের কথা ভাবতে গেলে যে শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও নিঃস্বার্থপরতা থাকা প্রয়োজন এদের তা একেবারেই নেই। এরা ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ। ফলে এরা প্রকাশ্যে অন্তর্ঘাত, অহিংসা, ইত্যাদিতে প্ররোচনা দিয়ে থাকেন। এরা গরীবদের নিয়ে রাজনীতি করেন, বিদেশীর উৎকোচ নেন, দেশের সর্বনাশ করেন। বিদেশীরা কোটির হিসাবে মুনাফা লুটেন আর লক্ষের হিসাবে ঐ সব রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাসবাদী ও কুচক্রীদের মধ্যে বিতরণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিষ্কার রাখেন।

সুতরাং প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন। এখনও দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ্ বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ও যোগ্য। এখনও দেশের বেশিরভাগ পত্রকার শুভ বুদ্ধিযুক্ত। এখনও দেশে বেশির ভাগ লোক সুস্থ। যদি দেশে শিক্ষার প্রসার বাড়ে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায়, যদি মৌলবাদীদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারে আমরা অন্ধ না হয়ে পড়ি, যদি দেশী সমানগুণের পণ্য কিনতে আমাদের অনীহা না হয়, যদি আমরা যার যার কাজ করি, তবে দেশটা রক্ষা পাবে। তাহলে বিদেশীরা আমাদের নাচাতে পারবে না। কিন্তু এত সব কি হবে? হলে কবে হবে?

(*বনকুন্তলা*—১৯৯৩)

হিন্দুর ধর্ম ও মানুষের ভবিষ্যৎ

কবিগুরুর 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী স্বামীকে অনুরোধ করে বলেছিলেন পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে এবং ধর্মকে রক্ষা করতে। গান্ধারী বলেছিলেন, "ধর্ম নহে সম্পদের হেতু/মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু/ ধর্মই ধর্মের শেষ।" ধর্ম কী, ধর্ম কেন মানুষ পালন করে, ধার্মিক মানুষ কী পায় সংসারে ইত্যাদি প্রশ্ন অনেক মানুষের মনেই জাগে এবং মানুষ সেই প্রশ্নের উত্তরও খোঁজে। এই প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণে ও উত্তর দানে সীমাহীন পরিশ্রম করা হয়েছে এবং অগণিত লেখা হয়েছে। কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা থামে নাই, এষণা বন্ধ হয় নাই। এখন যে সংসারে ধর্মহীনতার রাজত্ব চলছে তাতেও এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অব্যাহত আছে। বর্তমান আলোচনাই তার প্রমাণ।

ধর্ম কী এই প্রশ্ন উঠলেই বোদ্ধা উত্তরদাতা ধর্ম শব্দটি কোন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সেই কথা বলে মনে করেন যে সেটি বুঝানো হল। কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, ধাতু বলতে যাঁরা সোনা, লোহা ইত্যাদি মনে করেন, তাদের জন্য এই 'ধাতু হইতে নিষ্পন্ন' এই আপ্তবাক্যটি মূল প্রশ্নটির সরল উত্তর না দিয়ে প্রশ্নটিকে আরো জটিল করে ফেলে। 'জল' নামক সম্যক পরিচিত বস্তুটি কী, এই সাধারণ প্রশ্নটির জবাবে যদি কোন বোদ্ধা উত্তরদাতা নিরক্ষর সরল-প্রাণ জিজ্ঞাসুকে বলেন যে, জল হাইড্রোজেনের দুটি ও অক্সিজেনের একটি পরমাণুর যৌগিক মিলনে সৃষ্ট একটি তরল পদার্থ, তাহলে বলা যতই না সঠিক হোক শ্রোতার যে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্ম কোন্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন বললেও শ্রোতার সেই অবস্থাই হয়। সুতরাং 'ধর্ম কী' কথাটির একটি কম বিদগ্ধ উত্তর পাওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে সেকুলার ভারতে কোন ব্যক্তি তার নিজের সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গেলে যে-সব খবর তার দিতে হয়, তার মধ্যে একটা হল, হোয়াট ইজ্ ইয়োর রিলিজিয়ন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি হিন্দুইজ্‌ম্ ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইসলাম, ইত্যাদির কোনো একটা লেখেন। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে সাধারণ মানুষের কাছে রিলিজিয়ন এবং ধর্ম সমার্থক। কিন্তু সকলেই জানেন যে বিভিন্ন কারণে শব্দের অর্থ বদলে যায়, শব্দ

নতুন অর্থ গ্রহণ করে এবং অনেক শব্দ আছে যাদের একাধিক অর্থও থাকে। আমরা নিরুপায় হয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি ধর্ম শব্দটির একটি অর্থ রিলিজিয়ন হয়ে গেছে। এই অর্থটি বদলাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা ধর্ম শব্দটির অন্য অর্থ অন্বেষণ করতে পারি।

প্রথমে পৃথিবীর বড় বড় ধর্মগুলির বয়স ঠিক করার চেষ্টা করা যাক। সবার আগে ইসলামের কথা বলি। ইসলাম সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম। পয়গম্বরের জন্ম হয়েছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ কোন মতেই ইসলামের বয়স চৌদ্দশ বছরের বেশি নয়। যীশুর জন্ম অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে ক্রিশ্চিয়ান ক্যালেন্ডার, সুতরাং ক্রিশ্চিয়ানিটির বয়স দু' হাজার বছরের কম। বৌদ্ধ ধর্মের বয়স আড়াই হাজার বছর; জৈন ধর্মের বয়স তিন হাজার। ইহুদীদের ধর্মের বয়স বলা হয় চার হাজার বছরেরও বেশি। বাকি রইল এই হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দু ধর্ম নামের দিক দিয়েও বিশিষ্ট। নামটি অন্যের দেওয়া। হিন্দুরা নিজেদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে। এটি নিত্য ধর্ম, সুতরাং এর কোন বয়স নেই। বিজ্ঞানী বলেন যে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল এককোষী শৈবাল দিয়ে। অগণিত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই শৈবাল থেকে আজ সৃষ্টি হয়েছে সংখ্যাতীত জীব। মানুষ তারই মধ্যে এক। কবে মানুষ বর্তমান আকার নিয়েছে, কবে সে বিজ্ঞানী হয়েছে এবং কী করে আরো কম সময়ে আরো বেশি মানুষ হত্যা করা যায় সেই সব অস্ত্রের সন্ধানে লেগেছে তার সঠিক সময় নির্ধারণ করা যায়নি। এই সক্ষমতার বিষয়ে বিজ্ঞানী ও সনাতনধর্মী সমান পারঙ্গম। মোটামুটি ভাবে আমরা ধরে নিই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাজার পাঁচেক বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই বয়স নির্ধারণে কেউ উষ্মা প্রকাশ করবেন না আশা করি। এতে হিন্দুর ধর্মের গৌরবহানি অথবা বৃদ্ধি করবার কোন অপপ্রয়াস নেই। এই বয়সটি বহুধাগৃহীত। এখানে এটি নেওয়া হল কেবল আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পার্থসারথী রূপে পার্থকে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপে পরিচিত। এই উপদেশ গ্রন্থে 'ধর্ম' শব্দটি বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য পৃথিবীতে বর্তমানে যে সব ধর্ম চালু আছে তাদের একটা বয়সও স্থির করেছি। দেখেছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবৎকালে বর্তমানে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত হিন্দু ধর্মটি ছাড়া আর কোন ধর্ম ছিল না; হিন্দু ধর্মটিকেও তখন কেউ ধর্ম বলত না, হিন্দু তো বলতই না। তখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম বলতে কী বুঝিয়েছেন? কেন ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করলেন তিনি বারবার? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন পরবর্তীকালে গীতার ভাষ্যকারগণ। তাঁরা বলেছেন যে গীতায় ধর্ম শব্দটি 'কর্তব্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।। (গীতা/৩/৩৫) শ্লোকটির Annie Besant কৃত অনুবাদ হয়েছে "Better

death in the discharge of one's own duty; the duty of another is full of danger." 'কর্তব্য' শব্দটিও বর্তমানে অন্য একটি অর্থে গ্রহণ করেছে। ফলে আমাদের কাজ আরও একটু কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে 'কর্তব্য' শব্দটির অর্থ হয়েছে 'কাজ'। অবশ্য বাঙ্গালীরা এটিকে কাজ না বলে duty-ই বলেন। তবে duty শব্দটির এই আধুনিক অর্থ 'ধর্ম' শব্দের অর্থ নয়। আধুনিক duty শব্দটির অর্থও একাধিক। এক—বেতন পাওয়ার জন্য যে কাজ করা হয়। (এতে ব্যত্যয় ঘটে গেছে। ক্ষমতাসীন দলের সোচ্চার সমর্থক হলে কাজ না করেই বেতন পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে তো শ্লোগানই তৈরি হয়েছে 'আসি যাই মাইনে পাই। কাজ করলে ও. টি. চাই,) দুই—বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ কাজ। যেমন সর্বজনীন দুর্গাপূজায় দর্শনার্থী জনতাকে দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য বাঁশ ধরার ভলান্টিয়ারের কাজ। তিন—চাকুরি। পুলিশের কাজ। চার—পেশা। উকিল, চোর, ছাত্র, টিউটর ইত্যাদি। আরো আছে। সব বলার প্রয়োজন এখানে নেই।

ছোটবেলায় একটি কবিতা পড়েছিলাম। তার দু'টি ছত্র এই রকম—'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়। তাই বলে কুকুর কামড়ানো কিরে মানুষের শোভা পায়!' এই যে 'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে'—এটি কুকুরের ধর্ম। কুকুর ভয় পেলে বা উত্ত্যক্ত হলে কামড় দিতে পারে। এই রকম ধর্ম সকল জীবের, এমন কি সকল বস্তুর আছে। লোহার ধর্ম কাঠিন্য, আগুনের ধর্ম তেজ, তাপ ও আলো দেওয়া। মানুষের কতকগুলি এই রকম মনুষ্যোচিত ধর্ম আছে। জীবন্ত প্রাণী হিসাবে মানুষের দু'টি ধর্ম আছে—আহার ও নিদ্রা। এগুলি জীবধর্ম। এগুলি জীবকে জড় থেকে পৃথক করেছে, স্বতন্ত্র করেছে, এগুলি বাদে মানুষের নিজস্ব কতগুলি ধর্ম বা করণীয় আছে। সেগুলি মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বতন্ত্র করেছে। সেগুলি কি? মনু মহারাজ তাঁর সংহিতায় মানুষের ধর্মের পাঁচটি লক্ষণ আছে বলেছেন। মনুসংহিতার ভাষায় সেগুলি হল—'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচং সংযমমেব চ । এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্য পঞ্চলক্ষণম্।' অর্থাৎ যে ধর্ম পালন করলে মানুষ অন্য জীবজন্তু থেকে পৃথক হয় সেগুলি হল অহিংসা, সত্যাশ্রয়ী হওয়া, চুরি না করা, শুচি থাকা এবং সংযমী হওয়া। একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

অহিংসা কথাটির অর্থ আমরা সকলেই জানি। অকারণে হিংসা না করা। আত্মরক্ষা, বিপন্ন রক্ষা, দেশরক্ষা, দুষ্টের দমন ইত্যাদি কাজে যে অহিংসার নামে বিরত থাকে সে কাপুরুষ। অহিংসা শব্দটির অর্থ করার সময় অনেকে সর্ব কর্মে অহিংসার পরামর্শ দিয়ে অনর্থ করে থাকেন। এই সম্পর্কে কারো সন্দেহ থাকলে তিনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে সিংহ নামক সেনাপতির কথোপকথনটি পড়তে পারেন। অহিংসা মন্ত্রের সর্বপ্রধান পুরোহিত ভগবান বুদ্ধ অহিংসককে রক্ষার কাজে সহিংসক হওয়ারই পরামর্শ দিয়েছেন।

সত্যাশ্রয়ী হওয়া। এটি মানুষ হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। যার জীবন ভিতর বাহির একরকম তিনি সত্যাশ্রয়ী। সত্য কথা বলা 'সত্যাশ্রয়ী' হওয়ার একাংশ মাত্র। কথায় চিন্তায়, কাজে ও ব্যবহারে সর্বদা ও সর্বথা যিনি সত্যকে আশ্রয় করে থাকেন তিনিই সত্যাশ্রয়ী। বস্তুতঃ সত্যাশ্রয়ী হওয়া একটি আদর্শ, একটি কল্পনা, বাস্তবে তা সহজ তো নয়ই, সম্ভবও নয়। এ কথা তো সকলেই জানেন যে ত্রুটিহীন কোন মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়? ত্রুটিহীন মানুষ কেবল কল্পনাই করা যায়। মানুষ সত্যাশ্রয়ী হওয়ার আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে এবং ক্রমে মনুষ্য, মনীষী ও মুনি হয়ে উঠবে। মনুসংহিতায় ঐ শ্লোকটিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ ও সংযম নামক যে পাঁচটি লক্ষণের কথা বলা আছে তার মধ্যে সত্য বা সত্যাশ্রয়ী হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান গুণ। বলাইবাহুল্য যে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর পক্ষেই সত্যাশ্রয়ী অথবা মিথ্যাশ্রয়ী হওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। আবার শারীরিক ভাবে মানুষ হলেও কেউ সত্যাশ্রয়ী হয়ে যায় না। তাকে সত্যাশ্রয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। হিন্দু জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে জন্মসূত্রে সব মানুষ সমান এই অযৌক্তিক ও অহেতুক দাবী অস্বীকার করে। তাই হিন্দু মনে করে যে পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে কেউ কেউ সাধারণের চেয়ে বেশী বুদ্ধি, মেধা, শক্তি অথবা সত্যানুরাগ নিয়েই জন্মান। যারা শিক্ষক তারা এই বিষয়টি খুব ভাল করে উপলব্ধি করতে পারেন। কিছু শিক্ষার্থী অল্পায়াসে যে পাঠ শিখে ফেলে তা অন্য অনেক শিক্ষার্থী বহু পরিশ্রম করে তবে আয়ত্ত করে, অনেকে পরিশ্রম করেও পারে না। এই অসম মেধার কোন সাংসারিক ব্যাখ্যা নাই। এটি কেবল 'মানুষ জন্মসূত্রে সকলে সমান'—এই বক্তব্যটি ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। মূল কথা হল এই যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া মানুষের ধর্ম।

তৃতীয় লক্ষণটি অস্তেয় বা অচৌর্য বা চুরি না করা। 'পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করার নাম চুরি।' চুরি বিভিন্ন স্তরে হয়। পকেট কাটাও চুরি, গরুর খাদ্য না কিনে মিথ্যা ভাউচার দিয়ে হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করাও চুরি। ঠিকমত সিমেন্ট না দিয়ে স্টেডিয়াম তৈরি করাও চুরি, নামী নির্মাতার দামী উৎপাদন নকল করে তৈরি করাও চুরি, পরীক্ষায় বই দেখে লেখাও চুরি এবং অপরের রচিত সাহিত্য থেকে ভাষা অথবা ভাব নিয়ে লিখে তা নিজের বলে চালানোও চুরি। এই রকম সাহিত্য চোরকে সংস্কৃতে কুম্ভিলক বলা হয়। ভারতবর্ষের হলদি ও নিমকে যখন আমেরিকায় পেটেন্ট করা হয় তখন তা চুরি হয়। হাসপাতালের ডাক্তার রোগীকে, বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রকে, বাস্তুকার ঠিকাদারকে, মন্ত্রী ব্যবসায়ীকে যদি বাড়িতে যেতে বলেন এবং সেখানে যদি দেয়া-নেয়া হয় তবে তা চুরি। যে মানুষ যতটা চুরি করেন তিনি ততটাই মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরে যান। জন্তুদেরকেও দেখি একে অপরের খাদ্য চুরি করে। এগুলি চুরি নয় দু কারণে। প্রথম কারণ যে ক্ষুধার্ত জন্তু যেখানে খাদ্য দেখে সেখানে তাই খায়। দ্বিতীয়তঃ জন্তুর নিজের ও পরের দ্রব্য সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই।

তা ছাড়া জন্তু কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি,—তাৎক্ষণিক ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ভবিষ্যতে দাম বাড়ানোর লোভে সামগ্রী গুদামজাত করে রেখে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করার মত সুসভ্য সমাজের বুদ্ধি জন্তুর কোন দিনও হবে না। জানোয়ার তো! চুরি না করা ধর্মটিও কেবল মানুষের।

চতুর্থ লক্ষণটি শৌচ। অর্থাৎ শুচি থাকা, মানুষ হওয়ার লক্ষণ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের কারণে রোগ যাতে না হয় সেই কারণে কেবল শরীর নয়, ঘর-দোর, রাস্তা-নর্দমা সমস্ত পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার পরামর্শ মাঝে মাঝেই রেডিও, টিভি. পত্র-পত্রিকা ও পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে ; বিশেষ করে যখন কোথাও আন্ত্রিক, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া বা প্লেগের মত মারাত্মক রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে। মনু মহারাজ তাঁর সংহিতায় এই উপদেশটি কয়েক হাজার বছর আগে দিয়েছেন এই যা। এখনকার মহারাজরাও এই উপদেশ দেন। তবে পার্থক্য আছে। মনু মহারাজ বলেছেন যে শুচিতা একটি মনুষ্যোচিত কর্ম, তার বিপরীত কর্ম করলে, অর্থাৎ অশুচি থাকার স্বভাব থাকলে তা মানব-স্বভাব বিরোধী বা অমানুষের কর্ম হবে। তবে এ কথা তো আধুনিক মহারাজারা বলতে পারবেন না। তারা তো প্রজার ভোটের উপর নির্ভরশীল। শৌচ কথাটির অর্থ আধুনিক পরিচ্ছন্নতার অপেক্ষা ব্যাপক। আধুনিক সমাজে তো সামনা (facade) সর্বস্ব। এখন মানুষ পাশ্চাত্যের ঘৃণার যোগ্য ফ্যাসানের শাখামৃগসুলভ অনুকরণে লিপ্ত। তাই অবগাহন, আচমন, ইত্যাদির পরিবর্তে কসমেটিকস্, ডিওডোরান্ট ও টয়লেট পেপারের ব্যবহার বাড়ছে। মানুষের ধর্ম-লক্ষণের শৌচ কেবল দেহের শৌচ নয়, মনের শৌচও বটে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অতুলনীয় উপমা স্মরণ করা যেতে পারে। ধর্মসভায় বসে শাস্ত্রীয় প্রবচন শুনতে শুনতে কু-স্থানের কথা ভাবলে প্রবচন শোনার ফললাভ হয় না। এখনকার পরিচ্ছন্নতা তা নয়। এখন এইড্স্ নামক রোগ থেকে বাঁচতে হলে যৌন যথেচ্ছাচার বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয় না। কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে যৌন যথেচ্ছাচার করা যাবে তার পরামর্শ দেওয়া হয়। রাস্তায় লাইট ও ফোনের থামে থামে এমন বিজ্ঞাপন টাঙানো হয় যার দিকে তাকানো যায় না। মনে হয় উনিশশো সাতানব্বই-এ বুঝি আমরা বাইবেলের প্রাচীন খণ্ডে বর্ণিত সোডোম গোমোরাহতে ফিরে গেছি। উদর ও উপস্থ সর্বস্ব এই সভ্যতায় মানুষকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তৈরি করার প্রয়াস চলেছে বিদেশী ষড়যন্ত্রে ও দেশী শিক্ষিত নির্বোধ কিছু আমলার সহযোগিতায়।

মনুসংহিতায় নির্দেশিত পাঁচটি ধর্ম লক্ষণের পঞ্চমটি হল সংযম। এই কথাটির অর্থ দমন, নিয়মন ইত্যাদি। যে কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করে সংযত ভাবে চলা যে ভাল সে কথা সকলেই বলেন কিন্তু এইরূপ কথিত রূপে সংযত ভাবে চলেন এমন লোকের দেখা তো কালেভদ্রে মিলে। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বন্ধু তিন বছরের

পুত্র পড়াশোনা করে না বলে ভীষণ রাগ করেছেন বলে অজয়বাবু বন্ধুকে সৎ পরামর্শ দিলেন। এত রাগারাগী করলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। ছেলে উদ্ধত হয়ে উঠবে। আর তার নিজের পক্ষেও বেশি রাগ করা খারাপ। উচ্চ রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র বিকল, মিষ্টরক্ত হওয়া, বদহজম, অন্ত্রক্ষত ইত্যাদি রোগ প্রধানত অত্যধিক ক্রোধ থেকেই জন্ম নেয়। সেই অজয়বাবু এক ঘণ্টা পরে বাড়িতে এসে দেখলেন তার পাঁচ বছরের পুত্রটি বই খুলে রেখে দেশলাই-এর বাক্স দিয়ে মন্দির বানাচ্ছে। আচমকা এমন থাপ্পড় মারলেন অমনোযোগী পাঁচ বছরের ছেলেকে যে তার কান দিয়ে রক্ত এলো। ডাক্তার বলে দিলেন যে তার এই কানটি চিরকালের জন্য শ্রবণশক্তি হারিয়েছে। এর নাম সংযম! মনুমহারাজ বলেছেন যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যরূপী শত্রুগুলিকে সংযত রাখা মানুষের লক্ষণ। এ বিষয়ে যত বেশি অসংযত হওয়া যাবে ততই মনুষ্যত্ব থেকে দূরে থাকা হবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম প্রয়োজন। বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের বিক্রয় প্রচারের বন্যায় বাস করে ইন্দ্রিয় সংযমের কথা পাড়লে তা বাতুলতার সামিল হবে। অসংযমই এখন সভ্যতার মাপকাঠি। ঔষধ বিক্রেতা এখন বিজ্ঞাপন দেয় যখন খুশি, যেখানে খুশি যত খুশি খান, কুছ পরওয়া নেই, ওদের তৈরি একটা বড়ি খেয়ে নিলেই আর বদহজমের কোন ভয় থাকবে না।

সুতরাং ধর্ম কেবল পূজাঅর্চা, ব্রত উপবাস, মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ নয়; ধর্ম একটি কৃষ্টি যা মানুষকে মানুষ করে তোলে। অহিংসা, সত্যানুরাগ, অচৌর্য, শৌচ ও সংযম সম্বন্ধে কারো কোন দ্বিমত থাকবে না বলে সকলের মনে হয়। কিন্তু আসলে তাও সত্য নয়। বর্তমান পৃথিবীতে হিংসারই রাজত্ব চলছে। অস্ত্র তৈয়ার ও বিক্রয় সবচেয়ে লাভদায়ক ব্যবসা। বস্তুবিজ্ঞান একদিকে মানুষের শ্রম কমিয়েছে, রোগ যন্ত্রণা উপশম করেছে, উৎপাদন বাড়িয়েছে এবং অন্যদিকে নিত্যনতুন ভয়ঙ্করতর বিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করেছে। মানুষকে খুচরো ভাবে রক্ষা করেছে এবং পাইকারীভাবে নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা করেছে। হিংসা কেবল ক্ষুদ্র চোর, ডাকাত, কিছু মন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—বিভিন্ন রাষ্ট্র আজ হিংসায় মদত দিয়ে বেঁচে আছে। এখন অহিংসার কথা বললে বুদ্ধিমান লোকে উপহাস করে। বর্তমান সময়ে নির্বোধ ছাড়া কেউ সত্যাশ্রয়ী হয় না। মানুষের সত্যের ধারণাই নেই। মিথ্যা বলা বা মিথ্যা আচরণ করা এখন সভ্যতার লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবেশীর অসুখ করলে কেউ তার বাড়িতে যান না, পাছে সাহায্য করতে হয়। অসুখ সারলে পরে তার সঙ্গে দেখা হয় এবং অসুখের কথা শোনা হয় আর আকাশ থেকে পড়েন সভ্য মানুষ—হাড় মিথ্যেবাদী। যাকে দেখলে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে তাকে দেখেই দন্ত বিকশিত করে 'কেমন আছেন? এই মাত্রই কেন জানি আপনার কথা মনে হচ্ছিল' বলে এগিয়ে যায় তারা। রাজনীতি, কূটনীতি, ব্যবসা, বিজ্ঞাপন, আইনব্যবসা এমনকি মন্দির মসজিদ গীর্জার অঙ্গনে মিথ্যার অবাধ বাণিজ্য চলছে। এখন সত্যাশ্রয়ী হওয়ার পরামর্শ কে দেবে

কে শুনবে? চৌর্যও এখন মহাসম্মানের বৃত্তি হয়ে পড়েছে। চুরি এখন আর চোর ক্ষুধার তাড়নায় করে না। চোরেরা এখন ক্ষমতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত। চুরির পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকা। চুরির বিষয় যুদ্ধের কামান, সংসদে ভোট, গরুর খড়, ব্যাঙ্কের লগ্নী, জুতার কারখানা, কী নয়? এমন লাভের ব্যাপার চুরি, এর বিরুদ্ধে অচৌর্যের উপদেশ দিলি কী বলবে সবে? শৌচ? ধোপদুরস্ত কাপড়-জামা সকলেই পরেন। সামান্য কদিন পরেই সেগুলি ফেলেও দেন। বাসাংসি এখন আর জীর্ণানি হয় না—বড় লোকেরা প্রত্যেক দিন স্নান করার সময় পান না সকলে। খাবার পরে এবং শৌচালয়ে নানাবিধ দামী কাগজ ব্যবহার করেন! স্নো, পাউডার, সেন্ট, ডিওডোরান্ট ইত্যাদি কত জিনিসই আছে ওদের। কিন্তু মন ক্লেদাক্ত, চিন্তা অশুচি, ধ্যান চৌর্য। এই তো আধুনিক মানুষ, কার ক্ষমতা আছে এদেরকে শুচিতার পরামর্শ দেয়ার! আর সংযম? সে তো দরিদ্রের কর্তব্য। যার পয়সা নেই তার সম্বল হবে সংযম। সে সদা সংযত থাকবে। বাজার শেষ হওয়ার সময়ে সে ঝড়তি পড়তি কিনে আনবে সস্তায়। একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা এ-বার সে-বার পালন করবে তারা। কথায় কাজে সংযত থাকে সে। দেবতার দুয়ারে ধরনা দেবে কিছু পাওয়ার আশায়। যার সব আছে সে নিজের ক্ষমতায় আরও অর্জন করবে। সংযম তার জন্য নয়।

সুস্থ মানুষের শরীর বলতে বোঝায় তার ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স, তার চামড়ার রঙ, তার চুলের পারিপাট্য, তার গালের টোল, ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই জানি এহ বাহ্য। যে কোন দিন আবিষ্কার হতে পারে যে তার কাঠামোর হাড় রোগগ্রস্ত হয়ে গেছে, তার হৃদযন্ত্রের কুঞ্চন-প্রসারণ বেতালা হয়ে গেছে, তার অগ্ন্যাশয় ঠিক পরিমাণে জারক রসটি তৈরি করতে পারছে না। তার পিত্তাশয়ে শিলাখণ্ড জমেছে, তার বৃক্ক অসুস্থ বা হাজারো রকমের রোগের কোন একটা বা একাধিক তার হয়ে গেছে। তক্ষুনি শরীরের দীপ্তি দ্রুত নিষ্প্রভ হয়, পদক্ষেপ শ্লথ হয়ে যায়, চক্ষু ঔজ্জ্বল্য হারায়, চক্ষুর পাশেই কাকের পদচিহ্ন দেখা দেয়, নিচে কালির দাগ জমে—আরও কত কি হয়। সমাজও একটি শরীর। মানুষের সমাজ মানুষ দিয়ে গঠিত। সেই মানুষগুলির মনুষ্যত্ব সমাজের সুস্থ স্বাস্থ্যের ভিত্তি। মানুষ কোথায় এখন? দ্বিপদ যে মনুষ্যাকৃতি জীবটি আজ সর্বত্র চড়ে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে মানুষ আছে ক'জন? এক এক করে বিচার করলে এদের মধ্যে ব্যাঘ্রত্ব, মার্জারত্ব, শৃগালত্ব, সারমেয়ত্ব, শকুনিত্ব, পেচকত্ব, সর্পত্ব, কুম্ভীরত্ব, ভীমরুলত্ব, বায়সত্ব ইত্যাদি গুণের প্রাধান্য পাওয়া যাবে কিন্তু মনুষ্যত্ব পাওয়া যাবে না। আজকের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষ মনুষ্যত্বের বিরোধী। শরীরের রঙ ও রূপ যেমন স্বাস্থ্য নয় তেমনি মানুষের মত চেহারা হলেই মানুষ হয় না। লক্ষ্মীপূজা বা তুলসী গাছের সামনে প্রদীপ দেওয়া বা চণ্ডীপাঠ ধর্মের মূল নয়, অলঙ্কার মাত্র। অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিন্তু এগুলি দেহ নয়। বিবাহে প্যান্ডেল সাজানো হয়, গেট বসানো হয়, আলোর বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়।

বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতগণ ভুরিভোজ পান, বাদ্য বাজনা বাজে। কিন্তু সকলেই জানেন এগুলি বিবাহ নয়। বিবাহে অনেক ছ্যাবলামো হয়, তিক্ততা হয়, অশ্লীল ইঙ্গিত ও কথা হতে পারে; এগুলির জন্য বিবাহ নামক অনুষ্ঠানটি দায়ী নহে। ধর্মও তেমনি। পূজাঅর্চনায় বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। 'আচারের মরু বালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ' গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু এতে ধর্মের কোন দোষ নেই। বিদেশ থেকে আমদানী করা কোন যুক্তি, ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক না কেন, এদেশে প্রযোজ্য হবে না।

ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মের দেশ। সনাতন ধর্মই এখন হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত। এখানকার ধর্ম মনুসংহিতা বর্ণিত 'ধর্মস্য পঞ্চ লক্ষণম্'-এর মধ্যে বিধৃত। এগুলি অন্য কোন ধর্ম- শাস্ত্রে নেই, অন্য কোন দেশে নেই। সুতরাং কোন দেশের দার্শনিক বা রাষ্ট্রনেতা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রবক্তা যদি ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেও থাকেন তা হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ সেই প্রবক্তার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানই নেই। তিনি 'ধর্মস্য পঞ্চ লক্ষণম্' জানেন না। এগুলি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত পৃথিবীর সর্বত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয় তা হয়নি। আমার দেশের লোকও জানেন না যে অহিংসা, সত্যাশ্রয়, অচৌর্য, শৌচ ও সংযম নামক পাঁচটি নিয়ম মানলেই মানুষ সনাতনধর্মী হয়, মানুষ হয়, হিন্দু হয়। তিনি মন্দির, মসজিদ, গীর্জা বা অন্য কোথায় প্রার্থনা করেন অথবা তিনি নাস্তিক বলে প্রার্থনা করেন না, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এগুলি না মেনে সমস্ত উপচার দিয়ে, সমস্ত মন্ত্র পড়ে সমস্ত শাস্ত্র নির্দেশিত পূজা করলে মানুষ হওয়া যায় না; হিন্দু হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আজ পৃথিবী মনুষ্যত্ববিরোধী মানুষের কবলে চলে গেছে। সন্ত্রাস মনুষ্যসমাজকে গ্রাস করে নিচ্ছে। ভ্রষ্টাচার সমাজের স্তরে স্তরে কৃমির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাষ্ট্র-প্রধানেরা উৎকোচ গ্রহণ ও দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করার দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছেন; পুরোহিত ধরা পড়ছেন যৌন অপরাধের দায়ে; মন্ত্রী পাহাড় প্রমাণ অর্থ আত্মসাৎ করছেন রাজকোষ থেকে; ভেজাল চলছে খাদ্যে, বস্ত্রে, ঔষধে, নির্মাণে; নরনারীর স্বাধীন মেলামেশা বন্ধনহীন উদ্দাম স্বেচ্ছাচারে পরিণত হচ্ছে; শিক্ষার্থী নকল করতে না পারলে শিক্ষককে নির্যাতন করছে; শিক্ষক সম্ভাব্য প্রশ্ন বলে দিয়ে অর্থ উপার্জন করছে; হাসপাতালের ডাক্তার হাসপাতালে অপারেশন করে বাড়িতে টাকা নিচ্ছে; পূজা কেবল চাঁদা আদায়ের কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে; মন্ত্রী দলের লোককে প্রাপ্যের অধিক দিয়ে এবং অন্যকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে, অসত্য ইতিহাস বলে এবং উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিয়ে জাতের বিরুদ্ধে জাতকে খেপিয়ে তুলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করছে। এসব হচ্ছে কারণ মনুষ্যত্বের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। মনুষ্যত্ব উপহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারই কি মানবজাতির অমোঘ ভবিষ্যৎ? এর থেকে উত্তরণের

কি কোন আশাই নেই? ধর্ম-বিশ্বাসীরা আশাবাদী হয়। তাদের নির্ভর ঈশ্বর। ঈশ্বরকে তারা সর্বকল্যাণদায়ী মনে করেন। তারা শত্রু-মিত্র, সন্ত্রাসবাদী ও শান্তিবাদী, আস্তিক ও নাস্তিক এবং পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মা সকলের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে। তারা মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার এ কথা মানতে পারে না। বিশেষত ইতিহাস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে অতীতে বহুবার বহুস্থানে এর চেয়েও বেশি খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে এবং ঈশ্বর তা থেকেও মানুষকে ত্রাণ করেছেন। মোজেসের জন্মকালে মিশরে ইজরায়েলীদের অবস্থা, যীশুর জন্মকালে মধ্যপ্রাচ্যে মানুষের অবস্থা, সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে মানুষের নৈতিক অবস্থা, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশদেশে সাধারণ মানুষের অবস্থা, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় কংসরাজার দেশের অবস্থা, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের জন্মসময়ে উত্তর ভারতের অবস্থা, ইদি আমিনের সময় উগান্ডার অবস্থা আমাদের সময়ের চেয়ে অনেক খারাপ ছিল। তারা উদ্ধার পেয়েছেন। আমরাও পাব। আমাদের পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমাদের সন্ততিদেরকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে হবে। প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে জিতে যাওয়ার জন্য সদসৎ বিচার না করে এগিয়ে যাওয়ায় প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে হবে। সেই বাধা আসবে শিক্ষার মাধ্যমে বিবেকের নির্দেশে। মানুষ হিংসুক অসত্যবাদী, চোর, অশুচি ও অসংযমীকে সামাজিক ভাবে বর্জন করবে। শিক্ষার মাধ্যমে এমন বাতাবরণ তৈরী হবে যে ধর্ম ও কৃষ্টিবিরোধী কথা বলতে গিয়ে অবিমৃষ্যকারী নেতা জনবর্জনের ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে। তবে দেশে 'মানুষ'-এর সংখ্যা বাড়বে। তখন শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বক্তৃতা দিতে হবে না। এগুলি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠবে। উচিত শিক্ষা পেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমে যাবে। Education is the best contraception, কথাটি হাল্কা রসিকতা নয়, অত্যন্ত সত্য কথা।

এমন কবে হবে আমরা জানি না। একজনের জীবন স্বল্প-মেয়াদী। সমাজের জীবন দীর্ঘ। একশ বছর সেখানে তেমন দীর্ঘকাল নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মনুষ্যসমাজ শীঘ্রই সত্যের পথে পা বাড়াবে, চুরি করা সেই সমাজে লজ্জার বিষয় হবে, মানুষ শুচি থাকার চেষ্টা করবে, পরিমিত আহার নিদ্রার মধ্যে সংযত জীবন যাপন করবে। এমত সমাজে হিংসা থাকতেই পারে না। সনাতন ধর্ম—মানব ধর্ম—মানুষকে মানুষ করে তুলবে, তাকে রক্ষা করবে। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি ঃ।

(শাশ্বতী ভাবনা—আগস্ট, ১৯৯৮)

মানব বন্দনা

মহাপুরুষ শ্রী শঙ্করদেব

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ।।
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন চ চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।
ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই তিনটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা ও ভক্ত অর্জুনকে একটি গূঢ় তত্ত্বকথা বলেছেন। এই মাত্র তিনি পার্থকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। সেই রূপ সম্বরণ করে এবার তিনি বলছেন যে তাঁর এই রূপ অতি দুর্লভ। দেবতারাও এই রূপ দেখবার আকাঙক্ষা করেন। ভগবানের এই রূপ বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ ইত্যাদি কোন কিছুর দ্বারাই দর্শন করা যায় না। এই রূপ কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারাই দেখা সম্ভব। ভক্তিবলেই কেবল ভগবানে প্রবেশ করা যায়।

পরমপূজ্য মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা-প্রয়াসের আরম্ভেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক ও তার ব্যাখ্যার অবতারণা মূল বিষয় থেকে কিছুটা ব্যত্যয় মনে হতে পারে কারও কারও কাছে। কিন্তু বস্তুত প্রথম থেকেই আমি বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছি না। আচার্য শঙ্করদেবের প্রধান পরিচয় ধর্মীয় নেতা হিসাবেই। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর ধর্মের মূল কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণোক্ত শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্লোক তিনটিতে বিধৃত। আচার্য শঙ্করদেব বলতেন—জ্ঞান, তপস্যা, ত্যাগ, দান, যোগ, ইত্যাদি কোন কিছু দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পাওয়া যায় কেবল অনন্যা শুদ্ধা ভক্তির মাধ্যমে।

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্তান্তিনোপলের পতন ঘটে। শহরের বিশাল গ্রন্থাগারে প্রজ্জ্বলিত হয় বিজয়োৎসবের হুতাশন। যুগ যুগ সঞ্চিত গ্রন্থরাশির সেই বহ্ন্যুৎসবে পৈশাচিক আনন্দে মেতে ওঠেন বিজয়ীরা। সেই জিঘাংসু অগ্নির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সমগ্র ইউরোপ। হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা মানুষ চোখ কচলে জেগে ওঠে। সুদীর্ঘ মধ্যযুগীয় অজ্ঞান-অন্ধকারের অবসান হয়। শুরু হয় নব জাগরণের যুগ। সেই নব জাগরণের তরঙ্গ আয়ার্ল্যান্ড থেকে আসাম পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে

পড়ে। দেশে দেশে জন্ম হয় বহু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের। এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন ভক্ত, সাধক, সমাজসংস্কারক ও মানবদরদী। এঁরা প্রায় সকলেই বলেছেন মানব-প্রেমের কথা। ভারতবর্ষে এই নবজাগরণ শুরু হয়ে যায় চতুর্দশ শতক থেকেই। এদেশেও তখন বহু মহামানব জন্মেছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন দক্ষিণ ভারতের রামানুজ ও নিম্বার্ক, আছেন বল্লভাচার্য যিনি তেলেগু সন্তান হলেও বারাণসীতে জন্মেছিলেন; আছেন রামানন্দ ও মীরাবাই; আছেন পাঞ্জাবের শ্রীনানকদেব, উত্তরপ্রদেশের কবীরজী, বাংলার শ্রীচৈতন্য ও অসমের শ্রীশঙ্করদেব।

মধ্যযুগে মানুষের মধ্যে ধর্মের বহিরঙ্গের যত বাড়াবাড়ি চলছিল ততই তা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছিল। 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ' একেবারেই গ্রাস করে ফেলেছিল। ধর্মের নামে বিদ্বেষ ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনা কারণে প্রাণ দিয়েছে ধর্মের নামে। আত্মম্ভরী বিজয়ীর দল নরমুণ্ডের পাহাড় গড়ে গেন্‌ডুয়া খেলেছে। বর্ধিষ্ণু নগরীকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে নরনারী শিশুবৃদ্ধসহ। মানুষের জয়োল্লাসের তাণ্ডব পিশাচ নৃত্যে পশুরা লজ্জায় পালিয়ে গেছে দূরে।

এই মধ্যযুগীয় দীর্ঘ রাত্রির অবসান যতই নিকট হয়ে আসছিল ততই মানুষের মধ্যে ধর্মের বহিরঙ্গের বদলে অন্তরঙ্গকে জানবার আগ্রহ বাড়ছিল। ধর্মপুস্তকগুলিতে কী আছে তা সকলেই জানতে চাইছিলেন। বাইবেলকে গ্রীক, লাতিন ও হিব্রু ভাষার বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করতে চাইছিলেন তাঁরা। তেমনি রামায়ণ মহাভারতকে সংস্কৃতের হ্রদ থেকে তুলে আনতে চাইছিলেন ভারতীয়রা। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের কথা অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় বলেছেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

চন্দ্রচুড় জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।

এই রকম তৃষ্ণায় আকুল হয়ে কেবল বঙ্গ নয়, রোদন করত অহমীয়া, ওড়িয়া বিহারী, তেলেগু, মালয়ালী প্রভৃতি সকল ভারতীয় এবং ইংরেজ, ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ। কিন্তু তৃষ্ণার্ত হলে কী হবে, শাস্ত্র পড়বার অধিকার তো সকলের নেই।

শাস্ত্রগ্রন্থগুলির অভিভাবক যাজককুল। ভারতবর্ষে এঁদের নাম ব্রাহ্মণ। এঁরা বলেছেন—

অষ্টাদশঃ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং নরেন শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।

অর্থাৎ রামায়ণ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রসকল কেউ সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ইতর ভাষায় শুনলে আর রক্ষা নেই। একেবারে রৌরব নরক। অবস্থাটা ইউরোপে আরও

সাঙঘাতিক। বাইবেলকে ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন অনেকে।

তবু চেষ্টা থামেনি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে একদিকে একদল মহামানব ভক্তি ও প্রেমের বর্ষণে হিংসা, হানাহানি ও পশুত্বের গ্লানি ধুয়ে ফেলে মানুষের মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন, আর অন্যদিকে আর এক দল প্রতিভাবান মানুষ ধর্ম গ্রন্থ ও মহৎ গ্রন্থাদি অনুবাদ করে এবং ভক্তিমূলক সাহিত্য রচনা করে মানুষের আত্মিক উন্নতির সহায়তা করবার চেষ্টা করছিলেন। সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপই ইউরোপে ধর্মগ্রন্থ বাইবেল অনূদিত হয় আর ভারতে মহাকাব্য রামায়ণ অনূদিত হয় বিভিন্ন ভাষায়। আচার্য শঙ্করদেব এই দুইয়ের সমন্বয়। একাধারে তিনি ছিলেন ভক্ত ও ভক্তিমার্গের সেবক, অনুবাদক, কবি ও সাহিত্যিক।

বর্তমান অসম রাজ্যের নওগাঁ শহর থেকে মাইল পনের দূরে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে আলিপুখুরী গ্রামে ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশঙ্করদেবের জন্ম হয় ভুঁইঞাদের বংশে। যে পরিবারে শঙ্করদেবের জন্ম হয় তার নাম ছিল শিরোমণি ভুঁইঞা। ওঁরা ছিলেন সকলের সেরা ভুঁইঞা। শঙ্করদেবের বাবার নাম ছিল কুসুমবর। মা তাঁর জন্মের তিন দিন বাদেই মারা যান। ঠাকুরমা খেরসুতীর কাছেই মানুষ হন শঙ্কর। বারো বছর বয়েস হলে শঙ্করকে পড়তে পাঠানো হয় তৎকালীন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর টোলে।

বাইশ বছর বয়সে শঙ্করের পাঠ শেষ হয়। টোল ছাড়ামাত্রই সংসারের বোঝা তাঁর কাঁধে চেপে বসে। সূর্যবতী নামের এক কায়স্থ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের চার বছর পর একটি শিশুকন্যা রেখে সূর্যবতী ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রায় একই সময়ে দেহরক্ষা করেন শঙ্করের পিতাও। দু দুটি মৃত্যুর ঘটনা শঙ্করকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তিনি সংসার ত্যাগের কথা পর্যন্ত ভাবতে শুরু করেন। তবে কন্যার কথা তো ভুললে চলে না। কন্যাটির বিয়ে হওয়া মাত্র শঙ্কর বেরিয়ে পড়েন পায়ে হেঁটে ভারত দর্শন করতে। সঙ্গে চললেন আরও সতের জন। এঁদের মধ্যে শঙ্করের শিক্ষাগুরু মহেন্দ্র কন্দলীও ছিলেন। বিভিন্ন শিষ্যের রচিত জীবনী গ্রন্থে এই ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ভারতের বহু তীর্থস্থান ও বহু মন্দির দর্শন করেছিলেন তিনি তখন। এর মধ্যে ছিল গয়া, পুরী, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কাশী, প্রয়াগ, সীতাকুণ্ড, বরাহকুণ্ড, অযোধ্যা, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থান। স্থানে স্থানে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ আলোচনায় আত্মিক উন্নতি করেছেন তিনি। এই সব আলোচনা ও বিভিন্ন বৈষ্ণব পণ্ডিতদের প্রভাব পড়ে তাঁর চিন্তাধারায়। পরে তিনি অসমে যে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন তার মধ্যে এই প্রভাব প্রতিফলিত হয়। দীর্ঘ বারোটি বছর এইভাবে তীর্থ-পর্যটন, সাধুসঙ্গ ও জ্ঞান আহরণের পর তিনি অসমে প্রত্যাবর্তন করেন।

শঙ্করদেবের আবির্ভাবের সময় দেশে শাক্ত ও তান্ত্রিক সাধনার প্রাবল্য ছিল। শঙ্করদেবের পূর্বপুরুষেরাও শাক্ত ছিলেন। একজন তো তাঁর শক্তিভক্তির জন্য দেবিদাস

নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। গৌহাটির কামাখ্যা মন্দির, সদিয়ার তাম্রেশ্বরী মন্দির, দুবি-র পরিহরেশ্বর মন্দির, দেরগাঁওয়ের মহাদেব মন্দির, সেকালের শক্তি ও তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। তখন আর্য শক্তি সাধনার সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক আদিবাসী আচার ও আচরণ মিলে তন্ত্র সাধনার উদ্ভব হয়। কালে তন্ত্র সাধনায় বহু বিকৃত নিয়মের অনুপ্রবেশ ঘটে। পশুবলি, তন্ত্রমন্ত্র, ইন্দ্রজাল ইত্যাদিকে মোক্ষপ্রাপ্তির সহজতম উপায় বলে ধরে নেওয়া হয়। আচারের আধিক্য, বিকৃতপ্রবৃত্তির প্রভাব, বিচারের ক্ষমতাকে একেবারেই গ্রাস করে ফেলেছিল। এক চরম নৈতিক অধঃপতন ও বিকারগ্রস্ত অপধর্মের তমসায় সমাজ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

শঙ্করদেব তীর্থ সেরে বাড়ি ফিরলেন। এবার এই অপধর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। শুদ্ধা ভক্তির বন্যায় তিনি বিকৃত, আচার-সর্বস্ব, তামসিক শক্তিপূজার গ্লানিময় কালিমা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেলেন। তিনি তাঁর 'এক-শরণ-নাম-ধর্ম' প্রচার করতে লাগলেন। ভগবান এক—বিষ্ণু নারায়ণ, বা কৃষ্ণ; তাঁকে পাওয়ার পথও এক—ভক্তি। আত্মসমর্পণই এই ধর্মের মূল কথা। বিষ্ণু ছাড়া প্রণম্য নেই, অন্য কোন দেবতা নেই। এমনকি অন্য দেবতার পূজার প্রসাদ বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নয়।

শঙ্করদেব গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার পরামর্শ দেননি। ত্যাগই ভক্তির মূল কথা। কিন্তু সেই ত্যাগ বাহ্যিক নয় আন্তরিক; সেই ত্যাগ গৃহত্যাগ নয়, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। তিনি নিজে পূর্ণগার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেছেন, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহও করেছেন। সৎ ও সরল জীবন যাপন, আর শুদ্ধা ভক্তির আচরণ তাঁর ধর্মের মূল কথা। তাঁর প্রবর্তিত পথের উৎস মহাভারত—বিশেষ করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদর্শ।

শঙ্করদেব অসমের মাটিতে সর্বপ্রথম জন্মনিরপেক্ষ মনুষ্য-মহত্ত্বের কথা প্রচার করেন। কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করার জন্য ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাবার প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল-ডোমও, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন না যে ব্রাহ্মণ তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সামাজিক বিপ্লবের ফলে আচার্য শঙ্করদেবের শিষ্যদের মধ্যে দেখতে পাই সকল শ্রেণীর হিন্দু, এমনকি মুসলমানকেও।

শুরুতে শঙ্করদেবের জন্মস্থান তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে। একটি ছত্র বা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। 'নামঘর' কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে। পালা গানের মাধ্যমে ধর্মকে লোকপ্রিয় করে তোলেন তিনি। তবে তাঁর ধর্মের মূল উৎস শ্রীমদ্ভগবদগীতা। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।

নাম সঙ্কীর্তনের টানে শঙ্করদেবের শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে উত্তরোত্তর। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে এই গণতান্ত্রিক ধর্ম প্রচার সহ্য হলো না সকলের। প্রথমত, শঙ্করদেবের এই ধর্ম আচারহীন, আড়ম্বরহীন, পুরোহিতহীন। সমাজের তথাকথিত অভিভাবকেরা ধরে নিলেন যে এই ধর্ম সনাতন হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করছে। দ্বিতীয়ত,

শঙ্করদেব শাস্ত্র ও পুরাণগুলিকে পবিত্র সংস্কৃত ভাষার অঙ্গন থেকে ছিনিয়ে এনে ইতর অহমীয়া ভাষার পোশাক পরিয়ে জনতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করছেন। চারদিকে রব উঠল *ধর্ম যায়, ধর্ম যায়। ব্রাহ্মণের একচ্ছত্র আধিপত্য যায়।* সুতরাং শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো তারা অহোম রাজা শুণ্ডমুণ্ড দিহিঙ্গিয়ার দরবারে। রাজা শঙ্করদেবকে আহ্বান জানালেন তাঁর দরবারে পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচারে। তর্কে শঙ্করদেব বিজয়ী হলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে অসমে তাঁর জীবন নিরাপদ নয়। সুতরাং তিনি চলে গেলেন বড়পেটায়। তখন বড়পেটা ছিল কোচরাজ নরনারায়ণের রাজ্যের অন্তর্গত। জীবনে আর অসমে ফেরেননি শঙ্করদেব। এখান থেকেই সাতানব্বই বছর বয়সে আবার বেরিয়ে পড়েন তীর্থ-পর্যটনে। এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন একশ' কুড়িজন শিষ্যের এক বিরাট তীর্থযাত্রীর দল। তাঁর এই তীর্থ-পরিক্রমা কালে শ্রীক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় চৈতন্যদেবের। শোনা যায় তাঁর সঙ্গে কবীরের দৌহিত্রীরও সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বড়পেটায় এসেই তিনি স্থির করলেন 'ভাগবত' অনুবাদ করবেন অহমীয়া ভাষায়। পঞ্চদশ শতকে অহমীয়ার মত একটি প্রাকৃত জনের বুলিতে ভাগবতের অনুবাদ করার সংকল্প দুঃসাহসের কাজ ছিল বটে। ইংল্যান্ডের ব্রাহ্মণেরা সেই সময়ে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করছে অনেক দুর্বিনীতকে বাইবেল অনুবাদ করার অপচেষ্টা-রূপ মহাপাতকের অপরাধে। অহমীয়া ব্রাহ্মণেরা কোচরাজা নরনারায়ণের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে শাস্ত্র অনুবাদ সদৃশ মহাপাপ সংকল্প থেকে নিরস্ত করতে শঙ্করদেবকে; তাঁকে শাস্তি দিতে। স্বস্তির কথা তাদের সে চেষ্টা তখন ফলবতী হয়নি।

কিন্তু ভাগবত অনুবাদের মত এত বড় কাজ একা করা যায় না। শঙ্করদেব নিজে অনুবাদ করলেন ভাগবতের ১ম, ২য়, ৩য়, ৮ম, ১০ম ও ১২শ খণ্ড। অনন্ত কণ্ডলী অনুবাদ করেন ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১০ম খণ্ডের কিয়দংশ। কেশবচরণ করলেন ৭ম ও ৯ম খণ্ড। আরও অনেকে করলেন কিছু কিছু করে। ভাগবতের অনুবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসমে নবজাগরণের সাড়া লাগে। অহমীয়া সাহিত্যে এর প্রভাব অপরিসীম। কেবল কৃষ্ণ কাহিনী বলে নয়; ছন্দ, পদলালিত্য, অহমীয়া বাগ-ধারার যথাযথ ব্যবহারে শঙ্করদেবের অহমীয়া ভাগবত এক অনন্য রচনা।

সমস্ত ভাগবতের মধ্যে আদিদশম বা দশম খণ্ডের প্রথম ভাগ সর্বাধিক জনপ্রিয়। এতে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা—পুতনাবধ, গোচারণ, ননীচুরি, গোপবালাদের কপট কলহ, যশোদার কাছে শ্রীকৃষ্ণের শাস্তি পাওয়া, ইত্যাদি। ধর্মশাস্ত্র হলেও আদি দশমখণ্ড নিতান্তই মানবিক। শিশুর চাপল্য, মায়ের আনন্দ, ভালবাসা, উদ্বেগ, এসবের সঙ্গে আর কিসের তুলনা হয়? উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কৃষ্ণকথায় রাধার ভূমিকা প্রধান হলেও শঙ্করদেবের অহমীয়া ভাগবতে বা তাঁর অন্য কোন রচনায় রাধার নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই।

[এর কারণ অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। মধ্যযুগের সেই অন্ধকার কালে জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড, কঠোর ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ, অন্ধ

কুসংস্কার, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল অপরিমিত যৌন যথেচ্ছাচার। আর এই যথেচ্ছাচার অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের আঙ্গিনায়, ধর্মের নামে চালানো হচ্ছিল; কোথাও গোপনে, কোথাও নির্লজ্জ প্রকাশ্যে। এই অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, বিভিন্ন দেশে। আচার্য শঙ্করদেবও এই রকম রুখে দাঁড়ানো মানুষদের একজন। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মনেতা, সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক। স্বভাবতঃই রাধার কাহিনী ও শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা তাঁর কাছে অন্তত সময়োপযোগী মনে হয়নি। তাঁর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল যে তখনকার সমাজসংস্কারের জন্য প্রয়োজন সব রকম চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগশূন্য এক ভক্তিবাদ। আর তাই তিনি দিয়েছেন তাঁর সমাজকে। সেই কারণেই রাধা অনুপস্থিত শঙ্করদেবের তাবৎ রচনা থেকে।]

শঙ্করদেবের **'নিমি নব সিধ সম্বাদ'** দর্শনভিত্তিক রচনা। এতে মহারাজ নিমির সঙ্গে নয়জন ঋষি যে তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন তা বলছেন নারদমুনি বাসুদেবের কাছে। এতে আছে ভক্তি, মায়া, মোক্ষ, কর্মযোগ ও অভক্তের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা। ধর্ম ও দর্শনের কঠিন তত্ত্ব আলোচনা এমন সাবলীল অহমীয়ায় শঙ্করদেব করেছেন যে পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারেন না।

'ভক্তি প্রদীপ' নামক গ্রন্থেও ভক্তির স্বরূপ আলোচনা করেছেন। 'অনাদি পাতন' নামক গ্রন্থটি প্রধানত ভাগবতের তৃতীয় খণ্ডের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও এতে বামন পুরাণের কিছু কাহিনীও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কোচরাজ নরনারায়ণের অনুরোধে শঙ্করদেব 'গুণাবলী' নামক স্তোত্র ও স্তুতিমূলক ভক্তিগীতি গ্রন্থটি রচনা করেন।

শঙ্করদেবের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা 'কৃষ্ণঘোষ'। অহমীয়া ভাষায় এমন জনপ্রিয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয়টি নেই। এমন অহমীয়া বাড়ি খুঁজে পাওয়া ভার যাতে একখণ্ড 'কৃষ্ণঘোষ' নেই। জনপ্রিয়তায় অহমীয়ার 'কৃষ্ণঘোষ' গ্রন্থটি হিন্দীর তুলসীদাসী 'রামচরিত মানস' ও বাংলার কৃত্তিবাসী 'রামায়ণের' সঙ্গে তুলনীয়। ভক্ত ও শিষ্যদের কাছ থেকে জানা গেছে যে আচার্য শঙ্করদেব বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণঘোষ' নামক কৃষ্ণ যশোগাথাটি রচনা করেছেন। এখনও 'কৃষ্ণঘোষের' গীতগুলি অহমীয়ারা পরম শ্রদ্ধাভরে গেয়ে থাকেন। 'কৃষ্ণঘোষ' একটি কবিতা বা কাব্য নয়। এতে আছে মোট ২২৬১টি শ্লোক। ২৬টি কবিতা। কিছু কিছু নাম শুনলে বিষয়টা অনুধাবন করা যায়। যেমন—আখ্যান, উপাখ্যান, কীর্তন, বর্ণনা ও বৃত্তান্ত।

শঙ্করদেবের কৈশোরের রচনা দুটি কবিতা 'রুক্মিণীহরণ' ও 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান'। 'বলিছলন' নামক আর একটি রচনা আছে তাঁর। কেবল কৃষ্ণ-কথায়ই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি। রামায়ণের 'উত্তরাকাণ্ড'টিও তিনি অনুবাদ করেছেন। এটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনাও বলা যায়। এতে লবকুশের গীত অংশে রামায়ণের মূল কাহিনীও বিধৃত আছে।

অহমীয়া সাহিত্যের অন্য দুটি শাখায়ও শঙ্করদেব পথিকৃৎ। একটির নাম 'বড়গীত'

বা ভক্তিগীতি। অন্যটির নাম 'অঙ্কীয় নাট' বা একাঙ্ক নাটক। এগুলি অহমীয়া সাহিত্যে নতুন সংযোজন। তবে এগুলি তিনি অহমীয়া ভাষায় রচনা করেননি। এগুলি করেছেন 'ব্রজবুলি' নামক কৃত্রিম ভাষাটিতে।

এখানেই শেষ নয়, শঙ্করদেবের সাহিত্যকর্ম। উল্লেখ করতে হয় 'চতিহা'র। তীর্থ পরিভ্রমণের সময় কাশীতে শঙ্করদেব কবীরজীর 'চৌতিসা' শুনতে পান কোন কবীরপন্থীর কাছে। 'চতিহা' সেই আদলে রচিত। প্রতিটি স্তবক বর্ণমালার এক একটি অক্ষর দিয়ে শুরু পর পর—ক, খ, গ ইত্যাদি।

শঙ্কর দেবের নাটকগুলির মধ্যে আছে 'কালিদমন', 'পত্নীপ্রসাদ', 'পারিজাত হরণ', 'রামবিজয়', ইত্যাদি। তাঁর আবির্ভাবের পুর্বে অহমীয়া সাহিত্যে কোন নাটক ছিল না। অন্তত ছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। তাঁর নাটকগুলির নাম শুনলেই মনে হয় যে এগুলি ইংল্যান্ডের মিরাক্ল্ ও মরালিটি নাটকের সমগোত্রীয়। ইংল্যান্ডের নাটকগুলির রচনা হয় ধর্মপ্রচারে সাহায্য করতে। শঙ্করদেবের নাটক রচনার কারণও তাই। এই নাটকগুলি অহমীয়া নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন।

পাঁচশ' বছর আগে আচার্য শঙ্করদেব তাঁর কাজ করে গেছেন। প্রায় সমসাময়িক ছিলেন চৈতন্যদেব, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণও। এদের প্রধান কৃতিত্ব মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করায়। জন্ম নয়, কর্মই মানুষের পরিচয়—এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁরা। উপনিষদের ঋষিও সেই কথাই ঘোষণা করে গেছেন—

> শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
> আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
> আদিত্য বর্ণং তমসো পরস্তাৎ।।

এই কথা বলার জন্য মহাত্মাদের কম কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। ইউরোপে এদেরকে জীবন্ত ফেলে দেওয়া হয়েছে জ্বলন্ত চিতায়। আমাদের দেশের প্রভুরা আরও দয়ালু ছিলেন। তাঁরা জিহ্বা-ছেদন বা অনুরূপ শাস্তি দিতেন মাত্র। গ্রীসে সক্রেতিসকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে সমাজ। যীশুখ্রিষ্ট প্রাণ দিয়েছেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে। শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের ঘটনা কুজ্ঝটিকার আড়ালে লুক্কায়িত। বিষজর্জর হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন গৌতমবুদ্ধ। অহোমরাজা শুণ্ডমুণ্ড দিহিঙ্গার দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে শঙ্করদেবকেও। পীড়নের ভয়ে দেশান্তরী হয়েছেন তিনি।

কিন্তু তবু এঁরা আসেন। মানুষের ত্রাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। মানুষের সভ্যতার রক্ষা ও বিকাশ হয় এঁদেরই জন্য। এঁদের প্রণাম জানাই।

('ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ'এর মুখপত্র
'ভাস্কর' এর ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত)

কার্ল মার্কস—একটি মহাজীবন

'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' এই পৃথিবীতে যত চলিত ভাষা আছে তার সবগুলিতেই বোধ হয় এই কথাটি উচ্চারিত হয়েছে, হচ্ছে, হবে। ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস (৩০) ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস (২৮) নামে দুই জার্মান যুবক 'কম্যুনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্র' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। কথা কটি ঐ পুস্তিকার শেষ ছত্র—একটি সমবেত আহ্বান। আসলে 'কম্যুনিস্ট লীগ' নামে একটি গুপ্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত তাদের গোপন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের বিশিষ্ট সদস্য এই দুইজনের উপর ভার দেন এই রকম একটি বই লেখার। এই বইটি কম্যুনিস্ট দুনিয়ার একটি পবিত্র দলিল।

১৮১৮ সালের ৫ মে তারিখে প্রুশিয়ার অন্তর্গত ত্রিয়েরের শহরে হাইন্‌রিখ ও হেনরিয়েটা মার্কস এর পুত্র কার্ল মার্কস্-এর জন্ম হয়। পিতা হাইন্‌রিখ ছিলেন স্থানীয় আইনজীবী সংসদের প্রধান। ১৮৩০ সালে ১২ বছর বয়সে কার্ল স্কুলে ভর্তি হন। সেই বছরই জুলাই মাসে ফরাসী বিপ্লব হয়। যোগাযোগটা কি নিতান্তই কাকতালীয়?

ত্রিয়েরের স্কুলটিও ছিল এক বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার পীঠস্থান। প্রধান শিক্ষকমশায় নিজেই ছিলেন দার্শনিক কান্ট-এর মন্ত্রশিষ্য। তিনি পড়াতেন দর্শন আর ইতিহাস। গণিতের শিক্ষকও খ্যাত ছিলেন বস্তুবাদী ও নাস্তিক হিসাবে। এই স্কুলের প্রভাব ভালভাবেই পড়ে মেধাবী ছাত্র কার্ল-এর উপর। তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হয়ে 'রাজকীয় পরীক্ষা পর্ষদ' মন্তব্য করেন ঃ 'এই ছাত্রটি প্রাচীন ভাষা, জার্মান, ইতিহাস ও গণিত বিষয়ে প্রভূত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে।'

১৮৩৫-এ আইনজীবীর ছেলে আইন পড়তে গেলেন। প্রথমে ভর্তি হলেন 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে চলে গেলেন 'বার্লিনে'। ১৮৩৬ সালেই আবাল্যবন্ধু, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, জেনি ফন ওয়েস্টফেলেনের সঙ্গে তিনি বাগদত্ত হন। বিয়ে হতে তখনও সাত বছর বাকি।

বার্লিনেই ভবিষ্যৎ কম্যুনিস্ট মতবাদ স্রষ্টার আসল শিক্ষা শুরু হয়। তিনি সমস্ত বিষয়েই পড়াশোনা করতে থাকেন। তবে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল দর্শন ও ইতিহাস। এই সময়েই তিনি তরুণ হেগেলবাদীদের আন্দোলনে যোগ দেন। অল্পবয়সী (২০)

এই তরুণটি কিছুদিনের মধ্যেই একজন অসাধারণ পণ্ডিত সদস্য বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৪১ সালে কার্ল পড়াশোনা শেষ করেন 'ডেমোক্রেটিয় ও এপিকুরিয় দর্শনের পার্থক্য' বিষয়ে একটি গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপিত করে। ঐ নিবন্ধের ভূমিকায় কার্ল গ্রীক পুরাণ-পুরুষ প্রমিথিউসকে মানুষের সুখ আর স্বাধীনতার জন্য নিজে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন বলে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৪১ সালে ১৫ এপ্রিল কার্ল মার্কস ডক্টর অব ফিলসফি উপাধি লাভ করেন।

ডক্টর কার্ল মার্কসের প্রথম বিপ্লবাত্মক লেখা 'বনসম্পদ অপহরণ আইনের পর্যলোচনা'। Rheinische Zeitung নামে যে পত্রিকাটিতে লেখাটি বেরোয় কার্ল মার্কস তখন সেটির সম্পাদক। পত্রিকাটি সরকারের কুনজরে পড়ে। মার্কসের কলম গর্জে ওঠে সেন্সরের বিরুদ্ধে। কিন্তু হলো না কিছু। ১৮৪৩-এ পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পত্রিকার মালিক পক্ষ তখন পত্রিকার সুর পাল্টাবেন ঠিক করলেন। মার্কস পদত্যাগ করলেন। কিন্তু পত্রিকা বন্ধই হয়ে গেল।

১৮৪৩ সালে কার্ল ও জেনীর বিবাহ সম্পাদিত হয়। ঐ বছরই কার্ল প্যারীতে গেলেন একটি বামপন্থী পত্রিকা প্রকাশ করতে। করলেনও। Detusch Franzosische Jahrbucher-এ মার্কস-এর লেখা প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় যে এতদিনে তিনি আদর্শবাদ ছেড়ে বস্তুবাদ গ্রহণ করেছেন ভাল করেই। কিন্তু ফ্রান্সে মার্কস-এর রাজদ্রোহী কার্যকলাপ প্রুশিয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে এই পত্রিকায় প্রকাশিত তরুণ ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর একটি লেখা মার্কস-এর চোখে পড়ে। প্রবন্ধটিতে এঙ্গেলস বলেছেন যে গরীবী মুক্ত সমাজ গড়তে চাইলে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অবশ্যই তুলে দিতে হবে। এতদিন দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করে মার্কস যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন, বুর্জোয়া অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলসও সেই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছেন। প্রবন্ধটি মার্কস-এর মন কেড়ে নিল।

এই প্রবন্ধের সূত্রে মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে যাবজ্জীবনের সখ্যতা শুরু হয়। তাঁরা দু'জনেই প্যারীর বিপ্লবী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই সময়েই প্রলেতারিয়ান সোশ্যালিজম বা মার্কসবাদের জন্ম হয়। ১৮৪৭ সালে প্রুশিয়া সরকারের নির্দেশে মার্কস ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হন। ঐ বছরেই মার্কস ও এঙ্গেলস 'কম্যুনিস্ট লীগে' যোগ দেন ব্রাসেলস-এ। এই লীগেরই লন্ডন কংগ্রেসে তাঁরা 'কম্যুনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্র' লিখতে অনুরুদ্ধ হন। ১৮৪৮ সালে মার্কস বেলজিয়াম থেকেও বহিষ্কৃত হন। তিনি প্রথমে প্যারী ও পরে কলোনে যান। ১৮৪৯-এ জার্মানীও তাঁকে বহিষ্কার করে। তখন তিনি লন্ডনে যান এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

লন্ডনে কার্ল মার্কসের নির্বাসন জীবন দুর্বিষহ অর্থকষ্টে কাটে। আজীবন এঙ্গেলসের নিঃস্বার্থ অর্থসাহায্য না পেলে মার্কসের 'ক্যাপিটেল' লেখা হতো না। তিনি

কোন রাজনৈতিক নির্বাসিতের দলে যোগ না দিয়ে একাকী পড়া ও লেখায় সময় কাটাতেন।

১৮৬৪ সালে লন্ডনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি—বিশ্ববিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিক—স্থাপিত হয়। মার্কস ছিলেন এই সংস্থার প্রাণ। এর প্রায় সমস্ত দলিল কার্ল মার্কস-এর লেখা। ১৮৭১ সালে প্যারী কম্যুনের পতনের পর তিনি 'ফরাসী গৃহযুদ্ধ—১৮৭১' শীর্ষক লেখায় এই পতনের কারণসমূহ যুক্তিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেন।

কঠোর পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। কিন্তু মার্কস তাঁর প্রধান কাজ—'ক্যাপিটেল' লেখা চালিয়ে যান। রাজনৈতিক অর্থনীতির এই বইটি তিনি সম্পূর্ণ শেষ করে যেতে পারেননি। কিন্তু এই বইটিই তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ, স্ত্রী জেনী মারা যাওয়ার এক বছর দুই মাস পর—কার্ল মার্কস-এর সংগ্রামী জীবন শেষ হয়। লন্ডনের হাইগেট কবরখানায় স্ত্রীর পাশেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এই মানুষটি সারাটা জীবন সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য লড়ে গেছেন। তাঁর প্রগাঢ় মনীষা বিশ্বমানবের কল্যাণের কথাই কেবল চিন্তা করে গেছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যা লিখে গেছেন তা কবি জন্ মিল্টনের এরিওপেজিটাকাকে স্মরণ করায়। বিশ্ব মানবতা চিরকাল কার্ল মার্কসকে নতুন যুগের প্রমিথিউস রূপে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবে। মানব সভ্যতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার কৃতিত্বের জন্য, তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তার জন্য, আর তার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের জন্য।

পৃথিবীর অসংখ্য বুভুক্ষু মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মার্কস শুধু সংগ্রাম করে যাননি, ভবিষ্যতের মানুষকে সেই সংগ্রামের বুনিয়াদ শক্ত করতে এবং তা রক্ষা করতে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন। একজন অসাধারণ প্রতিভাবান, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী হিসাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন। সেন্সরের বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন যে, "সেন্সরের ধারাল কলম সংবাদপত্রের চোখ অন্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।".....সেন্সরশীপ প্রতিদিন চিন্তাশীল মানুষের হৃদয়ে ছুরি বসায়। তারা কেবল হৃদয়হীন দেহটাকেই চলতে দেয়—বশংবদ দেহ, যার কোন প্রতিক্রিয়া নেই, নেই কোন জীবনের লক্ষণ।" সংগ্রামী মানুষ চিরকাল কার্ল মার্কসকে শ্রদ্ধা জানাবে।

[মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ-এর ছাত্র সংসদ দ্বারা প্রকাশিত কার্ল মার্কস মৃত্যু শতবার্ষিকী স্মরণিকা (১৯৮৩)য় প্রকাশিত]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

উনিশ শতক ভারতীয় সভ্যতার নবজাগরণের শতক। বহু শতাব্দী ধরে এই সুপ্রাচীন সভ্যতা গভীর অন্ধকারে ডুবে ছিল। ঘুমিয়ে ছিল। উনিশ শতকের আগে থেকেই ইউরোপের নতুন যুগের হাওয়া আসতে থাকে ভারতে। ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ নিদ্রার অবসান হয়। এই নবজাগরণ আরম্ভ হয় কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের মত বহু প্রতিভাধরের জন্ম হতে থাকে একে একে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও এই বিরল প্রতিভাবানদের মধ্যে একজন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, The least important information in the life of a hero is his father's name. কোন বড় মানুষের জীবন আলোচনায় তাঁর পিতার নাম কী ছিল সেটা কোন গুরুত্বপুর্ণ খবর নয়। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে একথা খাটে না। তাঁর সম্বন্ধে মানুষ এত কম জানেন যে মৃত্যু শতবর্ষের এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ব্যক্তিগত জীবনের কথাও একটু বলতেই হয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম হয় কলকাতায়। শুঁড়ায়। ১৮২২ সালে। তাঁর পিতার নাম ছিল জনমেজয় মিত্র। তিনি প্রথমে কিছুদিন মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে ছেড়ে দেন, পরে আইন পড়েন। তিনি বাংলা এবং ইংরেজি ছাড়াও ফার্সি, উর্দু ও হিন্দী ভাষা শিখেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি বিবলিওথেকা ইন্ডিকা নামে যে গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন তাতে মিত্র মশায় কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তিনি তদানীন্তন কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট ও সারস্বত সমাজ, প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। রাজেন্দ্রলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম সম্মানসূচক ডক্টর অব ল উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। তিনি বিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন রাজেন্দ্রলাল। তিনি ১৮৫১ সালে 'বিধিধার্থ সংগ্রহ' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। আরেকটি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'রহস্য সন্দর্ভ'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। তিনি ১৮৫০ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা অক্ষরে নাম লেখা প্রথম মানচিত্রটি তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৯১ সালে মিত্র মহাশয়ের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি সুন্দর শব্দচিত্র এঁকে রেখে গেছেন। 'মানুষ রাজেন্দ্রলালের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কবিগুরু। তিনি রাজেন্দ্রলালকে একজন 'অসামান্য মনস্বী পুরুষ' বলেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললে কি হয়, এদেশে কাজের কাজীর সংখ্যা যতই কম থাকুক না কেন, কথায় ব্যথা দেওয়ার লোকের সংখ্যা কম নেই। রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ প্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা বিষয়ে অনেক সংস্কৃত পণ্ডিতকে কাজে লাগাতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার মনে আছে, এই উপলক্ষে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী, ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন।" এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সর্বকালের মানুষের স্মরণযোগ্য। কবিগুরু বলেন, "আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশঃ তাহার মনে হইতে থাকে, 'আমিই বুঝি কৃতী আর যন্ত্রীটি বুঝি অন্যাবশ্যক শোভামাত্র'। কলম বেচারার যদি চৈতন্য থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন একদিন সে মনে করিয়া বসিত, লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালি পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।" কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর শতবর্ষ পরেও তাঁর প্রশংসাকারীর তুলনায় নিন্দুকের সংখ্যাই বেশি বলে মনে হয়।

তবে প্রশংসাকারী যে একেবারে নেই তাও নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' একটি দূরত্ব নির্দেশক প্রস্তরখণ্ড বিশেষ। প্রায় অর্ধশতক পূর্বে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'চরিতমালা'র চল্লিশ সংখ্যক খণ্ডের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সংক্ষিপ্ত প্রশস্তিমূলক পরিচয় রেখেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, তা আদ্যোপান্ত স্মরণযোগ্য। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একজন দিকপাল পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিৎ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি শুধু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, তাহা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও ছড়াইয়া পড়িয়া সেখানকার বিদ্বজ্জনসমাজে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার গভীর অধ্যয়ন এবং অক্লান্ত গবেষণার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদির বহু অজানা অন্ধকার কক্ষ অভিনব আলোকসম্পাতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য নহে, আর একটি কারণেও রাজেন্দ্রলালের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়—সেটি মাতৃভাষার প্রতি তাহার

অপরিসীম অনুরাগ। ইহার কল্যাণ, পরিপুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা করিতেন এবং কর্মব্যস্ত জীবনেও সাধ্যমত এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিকপত্র 'বিধিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদন, বাংলা পুস্তক সমালোচনায় নব ধারার প্রবর্তন, ভৌগোলিক পরিভাষা গঠন, প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় অন্যতম পথিকৃতরূপে তিনি বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন। পরিমাণে স্বল্প হইলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান উপক্ষেণীয় নহে। দুঃখের বিষয় যথাসময়ে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকশিত না হওয়ায় রাজেন্দ্রলালের অন্য কীর্তির আড়ালে তাঁর সাহিত্যকীর্তি চাপা পড়িয়া আছে।"

রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত সচিত্র বাংলা মাসিক পত্র 'বিধিধার্থ সংগ্রহ' এর উদ্দেশ্য ছিল to publish translations of such works as are not included in the design of the tract of Christian Knowledge Societies on the one hand, or the School Book and the Asiatic Societies on the other, and likewise to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal.

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' কিশোর রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি লিখেছেন—'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিধিধার্থ সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক ভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া নর্বাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"

মিত্র মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি গ্রন্থ আছে। মোট সংখ্যা ত্রিশের উপর। তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'স্বারস্বত সমাজ'-এর তিনি ছিলেন সভাপতি। ব্রিটেন ও ইতালীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিনি সম্মানিত সভ্য ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যে সম্মানসূচক LI.D উপাধি প্রদান করে তার প্রশস্তি পত্রে Vice Chancellor Arthur Hobhouse বলেন, "Dr. Rajendra Lal Mitra, whose voluminous works I only wish that I could study and understand. There is no European Society of Oriental Scholars to whom he is not honourably known, and there are many who have been

glad to admit him as a member and colleague. He has thrown light on many a dark corner of the history and antiquities and language of his country....His English is remarkably clear and simple and his arguments would do credit to any Sanskrit scholar in England."

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাস্তবিক অর্থেই একজন কর্মবীর ছিলেন। তিনি কলকাতা পৌরসভার কাজেও সংসৃষ্ট ছিলেন। ১৮৭৬ সালে পৌরসভার নির্বাচন ব্যবস্থা হলে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার আগেও তিনি একজন জাস্টিস অব্ দ্য পীস ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে যোগ ছিল প্রায় শুরু থেকেই।

সব শেষে উল্লেখ করতে হয় যে, যে 'সত্যমেব জয়তে' ভারতের জাতীয় বাণী হিসেবে গৃহীত হয়েছে স্বাধীনতা উত্তরকালে, তা দেড়শ' বছর আগে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ব্যক্তিগত আদর্শবাণী ছিল। (৭-১০-১৯৯১)

আমি, শরৎচন্দ্র ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

"কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে, 'দাদা বলে ডাক যদি দেবো গলা টিপে।' হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা, কেরোসিন শিখা বলে, এসো মোর দাদা।' বড়র সঙ্গে কুটুম্বিতা জাহির করা এবং ছোটর সঙ্গে কুটুম্বিতা অঙ্গীকার করার একটা প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছে। আমি ও শরৎচন্দ্র এবং তার পরিবারের সঙ্গে একটা কাল্পনিক নৈকট্য অনুভব করি। প্রথম কথা, স্বয়ং শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। তাঁর ও আমার জন্মদিন ভাদ্র মাসের অন্তিম দিন। দ্বিতীয় কথা, শরৎচন্দ্রের দু'টি ছোটভাই ছিল এবং তাদের একজনের নাম ছিল প্রভাসচন্দ্র। তৃতীয় কথা, শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। মতিলাল অস্থিরচিত্ত মানুষ ছিলেন। গল্প, উপন্যাস লিখতেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ততার জন্য সেই লেখাগুলো আর সম্পূর্ণ হতো না। বহু লেখা শুরু করা ও শেষ করতে না পারার মতিলালী বৈশিষ্ট্যটি আমারও আছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কাল্পনিক কুটুম্বিতার কারণের তালিকা এখানেই শেষ হয়নি। আরো আছে। শরৎচন্দ্র দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন বলে পড়াশোনায় বার বার বাধা আসে। পরে কলেজে কিছুদিন পড়তে পারলেও এফ. এ পরীক্ষার ফি কুড়ি টাকা জোগাড় না হওয়ায় তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। আমার পড়া তো সপ্তম শ্রেণীতে ওঠার পরই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দারিদ্র্যের কারণে। প্রায় ভিক্ষা করে পরের বাড়িতে থেকে ম্যাট্রিক তো পাশ হলো; কিন্তু আর হলো না। আমি এখন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। ডজনখানেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেছি। এখনো গোটা তিনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার বিভিন্ন বিষয়ে সম্পর্ক আছে। কিন্তু কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়তে পারিনি দরিদ্র ছিলাম বলে। ১৯০২ সালে বোধ হয় শরৎচন্দ্র ত্রিশ টাকা মাহিনার একটি চাকরি পান। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমি আগরতলায় জরীপ বিভাগে সাতাশী টাকা মাহিনায় চাকরি পাই। আমি মাটির প্রদীপ বটি, শরৎচন্দ্র চাঁদা, ক্ষতি কি বলি যদি তাঁকে আমার দাদা?

শরৎচন্দ্র বাংলার অবিসম্বাদিত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন এবং এখনো সারা ভারতের জনপ্রিয়তার নিরীখে তার স্থান যে কোন লেখকের ঈর্ষার বস্তু। তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলির দেখা বাংলার মাঠে ঘাটে পল্লীতে ও সমাজে যত্র তত্র হয়ে যেতো। গত ষাট বছরে দেশে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেশের

একাধিক খণ্ড বিদেশ হয়ে গিয়ে দেশের সঙ্গে বিধ্বংসী শত্রুতায় লিপ্ত আছে। দেশের অভ্যন্তরে মহাত্মা গান্ধী, বিনোবা ভাবে, আম্বেদকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় নিম্নবর্ণের মানুষের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার বহুল পরিমাণে কমেছে এবং ভোটের রাজনীতির প্রয়োজনে আইনের দ্বারা উচ্চবর্ণের দরিদ্রের ওপর নিম্নবর্ণের নজীরবিহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন পীড়ন চলছে। দেশে শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, যাতায়াত, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। গণতন্ত্রের উপজাত হিসাবে জনগণ নতুন জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার সময়ে দেশকে সেকুলার নামক নতুন অভিধা দেওয়া হয়েছিল। এখন সেইটিই সমস্ত রাজনেতার গায়ত্রী মন্ত্র হয়েছে এবং জাতপাতের রাজনীতি ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। সুতরাং দেশে এখন শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়নি। এখনো তাদের দেখা মেলে। শরৎচন্দ্র জীবিত থাকলে বা শরৎচন্দ্রের সমান প্রতিভাবান ও সহানুভূতিসম্পন্ন অন্য কোন লেখক এখন দেশে জীবিত থাকলে লেখনীর দ্বারা দেশের বিবেককে জাগাতে পারতেন। আমি মনে করি, শরৎচন্দ্র এই দেশের সমূহ উপকার করে গেছেন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ক্লেদ জমেছিল তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মানুষকে জাগ্রত করে এই ক্লেদ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। আজ আমাদের শরৎচন্দ্রের মত বিবেকজাগরণকারী ক্ষমতাবান একজনের বড় প্রয়োজন।

আজ ভারতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছে। এই সময় স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, যারা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন, যাঁরা জেল দ্বীপান্তরে গিয়েছিলেন, যাঁরা পুলিশের গুলিতে বা ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি সকলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। এই সব লোকের মধ্যে আমার কুটুম্ব দুজন আছেন। একজন আমার পিতা এবং অন্যজন বাঙ্গালীর অহংকার শরৎচন্দ্র। আমি আজ শরৎচন্দ্রের বা আমার পিতার বা অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে পারছি না। আমি দেখছি আমার চার পাশের মানুষ আজ শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। এদের অনেকেই ধোপদুরস্ত পোশাক পরিহিত, স্তাবক পরিবেষ্টিত; এরা দামী গাড়ি চড়ে নামী মানুষ হয়ে উঠেছেন। এদের এবং এদের জন্মদাতাদের অনেকেই ব্রিটিশ সরকারের খয়ের খাঁ, আমলা, পুলিশ, সংবাদদাতা অথবা অন্তত স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী ছিলেন। এদের অনেকেই আইনবিরোধী কাজে লিপ্ত। এরা সরকারী অর্থ আত্মসাৎ বা কালোবাজারী বা সন্ত্রাস বা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিদেশে বিক্রয় ইত্যাদি ন্যাক্কারজনক কাজে লিপ্ত থেকে স্বল্প আয়াসে অল্প সময়ে অর্থ অর্জন করে সমাজের উচ্চস্তরে উঠে গেছেন। এরা এখন রাজনেতা। এদের অঙ্গুলি হেলনে সমাজ চলে। আইন ও শাসন এদের হাতের মুঠোয়। এরা চুরি করলে ধরা পড়েন না; ধরা পড়লে পিছলে পিছলে বিচারশালার বাইরে থাকেন এবং বিচার তাদেরকে ধরার জন্য

চেষ্টা করে হয়রান হয়ে যায় কিন্তু বিচার করতে পারে না। আমি চক্ষু মুদলেই দেখতে পাই, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ঐ সব অসৎ ক্ষমতাবানদের মাল্য ও অর্ঘ পেয়ে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছেন। আমি দেখতে পাই কিন্তু এসব প্রকাশ করার ক্ষমতা নাই আমার। আমি কেবল কল্পনা করি, শরৎচন্দ্র যদি আবার আসেন তবে বড় ভাল হয়। কিন্তু আমি তো আর শিশু নই। আমি এও জানি যে তা আর সম্ভব নয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, শরৎচন্দ্র ও আমি। কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার সব।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে দেশবন্ধুর ডাকে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দেন। তখনই তিনি হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতিও হন। একটানা ষোল বছর তিনি হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তখনকার কংগ্রেস সভাপতির পাওয়ার কিছু ছিল না, ছিল কেবল দেওয়ার। তাঁর সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল গরমপন্থী রাজনীতির প্রতি। তাঁর বহু পুস্তকে শরৎচন্দ্র সেই সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নরমপন্থী কংগ্রেসের সভাপতি পদে তিনি টিকে ছিলেন ষোল বছর। আমার শুধু মনে হয় কত শত্রু ছিল তার? তুলনায় ছোট মানুষ আমি তাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কুটুম্বিতা আবিষ্কার করতে যাই। বেশ ক'বছর আমিও একটি জীবিকা সংসৃষ্ট সমিতির সভাপতি ছিলাম। ফলে আমার অনেক তথাকথিত বন্ধু শত্রু হয়ে গেছে। আমার একমাত্র অপরাধ এক বন্ধুর পরামর্শে অন্য বন্ধুর অহিত করতে রাজি হইনি। কুৎসা প্রচার, অপদস্থ করার প্রচেষ্টা, আদালতে মামলা, কত কি না করেছে ওরা। তবে হয়নি কিছু। সত্য পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, মাথা না নোয়ালেও চলে তার। ষোল বছরের দীর্ঘ কালে শরৎচন্দ্র কত পীড়া সহ্য করেছেন? ভাবি আমার লেখনী যদি শরৎচন্দ্রের মত প্রয়োজনে অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠতে পারতো তাহলে ঐ পীড়াও সইতে পারতাম।

শরৎচন্দ্র পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতিরও সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। মানুষের ক্লেশ, মানুষের উপর মানুষের পীড়ন, সামাজিক অত্যাচার, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উপর অত্যাচার, ভারত মাতার ওপর বিদেশী শাসকের অত্যাচার ইত্যাদি তার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নথিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর প্রাণ কতটা সংবেদনশীল তা এই সব বইয়ে বাণীবদ্ধ হয়ে আছে অনাগত কালের জন্যও। কিন্তু তিনি পশুক্লেশ নিবারণী সমিতিরও সভাপতি ছিলেন। এতে তাঁর প্রাণের অন্য একটি দিকের কথাও প্রকট হয়। দীন দুঃখী কোন দিন তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। সেই বদান্যতার অংশীদার ছিল অত্যাচারিত পশুও। এমন মানুষ কালে কালে ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। এই জন্যও শরৎচন্দ্রকে আমাদের আবার প্রয়োজন ছিল।

একজন জীবনীকার লিখেছেন এবং সমস্ত পাঠককুলই জানেন যে, "পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতিই তাঁর দরদ ছিল বেশী। আবার সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজ পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি তাঁর করুণা ছিল

আরও বেশী। পতিতা নারীদের ভুলপথে যাওয়ার জন্য তিনি হৃদয়ে একটা বেদনাও অনুভব করতেন।" শরৎচন্দ্রের জীবনাবসান হয় ১৯৩৮ সালে। এর পরে ষাট বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে নারী অগ্রসর হয়েছে অনেক। শিক্ষায় নারী এগিয়ে গেছে। অকল্পনীয়ভাবে। কেবল শতকরা হিসাবে নয়, উৎকর্ষের হিসাবেও। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম কৃতকার্যদের মধ্যে নারীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু শিক্ষা নারীকে দিয়েছে বেদনাবোধও। শরৎচন্দ্রের কালের নারী অবোধ ছিল। প্রায় পশুর মতো অবোধ থেকে সে অত্যাচার সয়েছে নির্বিবাদে। আজ শিক্ষিতা নারী সব বুঝে বলে অত্যাচারীর অত্যাচার বেশি বেদনা দেয় তাকে। তাই আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান। পণ, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, পতির বিপথগমন এখনও সম-মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু এখনকার এসব কাহিনী বিবেকের আয়নায় প্রতিফলিত করে সমাজের সম্মুখে তুলে ধরবার জন্য কোনও শরৎচন্দ্র নেই। সুতরাং আমি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষে নারী স্বাধীনতা রক্ষিত হচ্ছে না বলে শোকাকুল।

'সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস!' দ্বিজেন্দ্রলালের এই অমর উক্তিটির কথা বারম্বার মনে হয়। এই দেশে সংসদ থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত সমস্ত সভায় নির্বাচিত সভ্যগণের অন্ততঃ ত্রিশ শতাংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এমনকি আইন করার জন্য বেসরকারী বিল পর্যন্ত এসেছে। বিতর্ক হচ্ছে অথচ বাস্তবে কী দেখি? পাঁচ শতাংশ নারীও নেই বহু সভায়। শরৎচন্দ্র বা তাঁর মত কেউ থাকলে এই বিকট ভণ্ডামীর কথা উপন্যাসে উঠে আসতো। আমি সেই জন্য শরৎচন্দ্রের কথা মনে করে দুঃখ ভোগ করি।

যদি কেউ আজ ভারতের উন্নতির মন্থরগতির কারণ আবিষ্কার করতে গবেষণা আরম্ভ করেন তাহলে তিনি প্রধান যে কারণটির কথা বলবেন সেটি হ'ল কর্তব্যে অবহেলা। কেরল, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি কয়েকটি অঞ্চল বাদ দিলে দেশের অন্যত্র সর্বত্র কর্তব্যে অবহেলা এক প্রবল সামাজিক ব্যাধি হিসেবে বিদ্যমান। ছাত্রদের অধ্যয়নে, শিক্ষকের শিক্ষাদানে, চিকিৎসকের চিকিৎসায়, বাস্তুকারের বাস্তুকৃতিতে, পত্রকারের সংবাদ সংগ্রহে, খেলোয়াড়ের খেলায়, আরক্ষা বাহিনীর রক্ষায়, পুরোহিতের পৌরোহিত্যে অবহেলার এমন সর্বজনীন খেলা সমাজে আগে কোন কালে ছিল কিনা জানি না। এখন শাসক পর্যন্ত শাসনে অবহেলা দেখান নির্দ্বিধায়। এই অবহেলা অন্যায় করার প্রবৃত্তির জনক। সুতরাং ছাত্র নকল করে, শিক্ষক ট্যুইশান দেয়, চিকিৎসক নার্সিং হোম খোলে, বাস্তুকার ঠিকাদারের কুক্ষিগত হয়, পত্রকার অসত্য সংবাদ ছাপায়, খেলোয়াড় হারাজেতার চুক্তি করে খেলে, আরক্ষা বাহিনীর কর্তব্যে অবহেলার সুযোগে সন্ত্রাস বাড়ে, ধর্মে শ্রদ্ধার বদলে বুজরুকি সামনের আসনে বসে, অসাধু শাসক দেশের সম্পদ দেশের উন্নতির কাজে না লাগিয়ে নিজের উন্নতিতে

লাগায়। দেশের সমাজের সমস্ত স্তরে স্তরে এই পাহাড়প্রমাণ নীতিহীনতা বিদেশীর পক্ষে এদেশকে শোষণ করা সহজ করে দেয়। তারা নেশা করার হিরোইন ইত্যাদি বিক্রী করে, অশ্লীল ছবি দেখিয়ে গান শুনিয়ে সেই নেশাকে মর্মে প্রবেশ করিয়ে দেয়। তারা আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দিয়ে সাহায্য করে বিপথগামীদেরকে। নির্মিত বস্তুকে ধ্বংস করায়, নব নির্মাণ বন্ধ হয়, দেশের উন্নয়নের সমস্ত সম্পদ রক্ষার জন্য ব্যয় হয়, রক্ষাও হয় না। এই সব একত্রিত করে জনসমক্ষে তুলে ধরেন সমর্থ সাহিত্যিক। শরৎচন্দ্র একজন অত্যন্ত সমর্থ সাহিত্যিক ছিলেন। ঐরকম শক্তিশালী ও সমর্থ সাহিত্যিকের প্রয়োজন এখন দেশের। আমি শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে তাই তাঁর কথা এই ভাবে স্মরণ করি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে তাঁর কথা ভারতবাসীর বড় বেশী মনে হয় এই সব কারণে।

আমি হিন্দু। আমি ও আমার গোষ্ঠীবর্গ পরলোকগত আত্মীয়ের প্রতি বাৎসরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকে। আমরা যেমন দেবতার কাছেও আমাদের ও সকলের কল্যাণ ও শ্রী হওয়ার প্রার্থনা করি, তেমনি পরলোকগত পিতৃপিতামহের কাছেও প্রার্থনা জানাই। সে মতে শরৎচন্দ্রও আমার শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য পাত্র এবং তাঁর কাছে আমি প্রার্থনা জানাতে পারি। শরৎচন্দ্রের কাছে আমার প্রার্থনা, এই দেশে নতুন শরৎচন্দ্রের জন্ম হোক, দেশের দুর্ভাগ্যের মুল কারণ কর্তব্যে অহেলা অপসৃত হোক। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে দেশের উন্নতির প্রার্থনা জানাই আমি এবং আমার ও সকলের জন্য শান্তি কামনা করি। আর যে ধ্বনি শরৎচন্দ্র শত শত বার দিয়েছেন বিদেশী শাসকের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, সেই ধ্বনি দিই ভারতমাতাকে বন্দনা করে—বন্দে মাতরম্।

(*শরৎ স্মরণিকা,* ১৯৯৭)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—একটি বন্দনা

বছর কয়েক আগে আগরতলার একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাদের সাহিত্য মেলায় আমাকে একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। বিষয় 'ভারতীয় সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব'। উদ্যোক্তারা বিদ্বজ্জন। বিষয়টির ব্যাপকতা বিবেচনা করে তাঁরা আমাকে বেশ কয়েক মাস আগেই বলেছিলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী আমার বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখেছিলাম কতকগুলি তথ্য জানতে চেয়ে। আমার চিঠিতে একটা প্রশ্ন ছিল—আপনার ভাষায় আদিরূপের উদাহরণ কী? এই চিঠিগুলির জবাবে একটি কৌতুককর তথ্য জানা যায়। আমার অহমীয়া, ওড়িয়া এবং মৈথিলী বন্ধু জানান যে 'চর্যাপদ' তাদের ভাষার আদি উদাহরণ। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন যে চর্যাপদ তাঁদের ভাষারও আদি উদাহরণ।

বাঙালীরা আরও জানেন যে এই চর্যাপদের আবিষ্কর্তা বাঙালী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে চর্যাপদের পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেছিলেন। চর্যাপদ কী, অথবা এটি আসলে কোন্ ভাষার আদিরূপ, এসব আলোচনা আমার আজকের বিষয় নয়। অনেকের মনেই জিজ্ঞাসা ওঠা স্বাভাবিক—কে এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী?। কী কারণে গিয়েছিলেন তিনি নেপালের রাজদরবারে? কী করে তিনি রাজগ্রন্থশালায় খোঁজাখুঁজি করতে পারলেন? কেন নেপালরাজ হরপ্রসাদকে চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি দিলেন? এইসব জানবার প্রয়াসে আজ একটু হরপ্রসাদ পরিক্রমা করা যাক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি.আই.ই-র জন্ম হয় ১৮৫৩ সালের ৬ ডিসেম্বর কলকাতার অদূরে নৈহাটিতে। অনেক দূরের সময় সেটা। সিপাহী অভ্যুত্থানেরও চার বছর আগের কথা। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হতে তখনও দশ বছর বাকি। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনাবসান হয় ১৯৩১ সালের ১৭ নভেম্বর। পঞ্চান্ন বছর চলে গেছে তার মৃত্যুর পরেও। কিন্তু মৃত্যুর বছরটা বিংশ শতাব্দীতে হওয়ায় খুব একটা বেশি দূরের মনে হয় না। বলতে পারি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলার প্রাচীন এবং নবীনকালের মধ্যে সংযোগকারী সেতুস্বরূপ। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁর উপদেশ নিয়ে লক্ষ্নৌ গিয়েছিলেন অধ্যাপনা নিয়ে। তিনি*

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহধন্য ছিলেন এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। হরপ্রসাদ আবার শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি নিজে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র একজনই প্রথম বিভাগে সংস্কৃতে এম. এ পাশ করেন। তাঁর নাম হরপ্রসাদ। শাস্ত্রী উপাধিটিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পাওয়া।

চাকুরি জীবনের আরম্ভ হয় কলকাতার হেয়ার স্কুলে ট্রানস্লেশান মাস্টার হিসেবে। অল্পকাল মাত্র ছিলেন এখানে। পরে হলেন লক্ষ্ণৌর ক্যানিং কলেজে অধ্যাপক। ক্রমে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান, প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আজীবন। এই সোসাইটির জন্য, বিলাতের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির জন্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য তিনি বহু পুঁথি সংগ্রহ করেছেন নানা স্থান থেকে। তাঁর সংগ্রহের তালিকা দীর্ঘ। এই তালিকায় একটি নাম 'চর্যাপদ'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদের যোগ দেওয়া একটি স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন।"

এই পোড়ার দেশের আর যা কিছুরই অভাব থাকুক শত্রুর অভাব ছিল না কোন কালেই। ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরই শত্রু জোটে সবচেয়ে বেশি। হরপ্রসাদেরও শত্রু জুটেছিল। তিনি কালিদাসের মেঘদূতের একটি অনুবাদ প্রকাশ করলে তার শত্রুরা রাজসরকারে তাদের অভিযোগ জানায় যে হরপ্রসাদ একটি অশ্লীল বই লিখেছেন। নানাভাবে তারা হরপ্রসাদকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছেন। সুখের কথা তাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নি।

শাস্ত্রী মশায়ের পুঁথি সংগ্রহ ও প্রকাশের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং সেই কাজের ফল কী হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁর নিজের কথাই শুনতে পারি। তিনি লিখেছেন— "পঁচিশ বছরের মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রভৃতি জানিবার জন্য যে আগ্রহ তাহাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এখন লোকে ইতিহাসের কথা বলিলেই শোনে, অন্য কথা বলিলে বড় একটা শুনিতে চায় না। জিনিস কিন্তু ঠিক। সকলের আগে আমি কি সেটুকু চেনা চাই। সেই চেনার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। সেই আগ্রহটিকে ঠিকপথে চালান আমাদের বড়ই দরকার।"

বাহাত্তর বছর আগে ১৩২১ বঙ্গাব্দে শাস্ত্রী মশায় এই কথাগুলি লিখেছিলেন। সেখান থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন আমাদের আগ্রহ রাজনীতি,

সিনেমা, চটুল ও দেহসর্বস্ব গান আর উদ্দাম নৃত্যে। যে জিনিসটায় আমাদের একেবারেই আগ্রহ নেই তা হল ইতিহাস। ক্ষমতায় যারা আসীন তারা সর্বদা কল্পিত মিথ্যা কাহিনীকে ইতিহাস বলে বক্তৃতা দিচ্ছে আর দেশবাসীকে নিজেদের অতীত সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে। শিক্ষায়তনে ইতিহাস পাঠ এখন নোটবই, সাজেস্‌শান ও প্রাইভেট টিউটরের ডিকটেশনে পর্যবসিত হয়েছে। হায়রে দেশ!

বহু প্রবন্ধ ছাড়াও হরপ্রসাদ দু'খানি উপন্যাস, একটি কাব্যাংশ এবং চারটি দীর্ঘ গদ্য রচনা লিখেছেন। কত পুঁথি যে প্রকাশ করেছেন তিনি তার হিসাব নাই। প্রতিটি পুঁথির একটি করে বড় ভূমিকা লিখে পুঁথিটির পরিচয় দিয়েছেন। এই লেখাগুলিতে হরপ্রসাদের মনের প্রগাঢ় আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাভাষার উন্নতির জন্য বাংলাকে সংস্কৃত ও ইংরেজির কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে, এই ছিল তাঁর নির্দেশ। এই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য একেবারে পরিষ্কার। তিনি বলেছেন—

"অনেকে বলেন, নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গঠন করা আবশ্যক। অনেকে বলেন অন্যান্য ভাষা হইতে নূতন শব্দ আমদানী করা আবশ্যক। অনেকে বলেন চলিত কথা দিয়া যেরূপে হউক ভাব প্রকাশ হইলেই যথেষ্ট হইল। ইংরেজীতে যে ভাব এক কথায় ব্যক্ত হয়, বাংলায় যদি তাহাই ব্যক্ত করিতে তিন ছত্র লিখিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি নূতন শব্দ গঠন বা ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়ন উচিত নহে। আমরা এই তিনটি মতের কোনটিরই প্রশংসা করিতে পারি না।"

তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই তিনটি মতই প্রণিধানযোগ্য কিন্তু কোনোটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। সুতরাং প্রয়োজন মত সবগুলিই অংশত গ্রহণ ও বর্জনযোগ্য। তাই করতে হবে। আসল কথাটা হরপ্রসাদের ভাষায়ই শোনা যাক।

"বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে যেন বাঙ্গালায় ভাবিতে শিখা হয়। তাহা হইলে অনেক সময় নূতন ভাব আপনা আপনিই বাঙ্গালায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহার জন্য মাথা কুটাকুটি করিতে হইবে না।"

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আজ থেকে একশ' পাঁচ বছর আগে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদ এই কথাগুলি লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মশায়ের আশা ছিল সীমাহীন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে তিনি লিখেছিলেন—

"আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতি শুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যে উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত ভাবী লেখক, ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছেন; আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি শত শত মহাকাব্য বাঙ্গালীকে আনন্দে ডুবাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশদেশান্তরের পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে।"

এরই নাম ক্লেয়ারভয়েন্স—অলোকদৃষ্টি। একদিকে এমন দিব্য ভবিষ্যদ্দর্শন অন্য

দিকে ভাষা সম্পর্কে পরম উদার, সেকুলার মনোভাব, এই দুয়ের বিরল সমন্বয় ঘটেছিল শাস্ত্রী মশায়ের মধ্যে। বাংলা ভাষার দাবীতে 'জয় বাংলা' শ্লোগান শোনার প্রায় শতবর্ষ পূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন—

"বাংলার উপর হিন্দুদিগের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোন মতেই কম নহে। অনেক মুসলমান লেখক বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। ....মীর মসারফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' নামক যে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার একখানি রত্ন।"

বাংলা ভাযার উপর মুসলমানী প্রভাব সম্পর্কেও শাস্ত্রীমশায়ের মতামত পরিষ্কার। তিনি বলেন সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গালার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। সাহিত্য, সমালোচনা, ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা, বাংলা ভাষা, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি বহু বিষয়ে হরপ্রসাদ তাঁর মতামত দিয়ে গেছেন অসংখ্য প্রবন্ধে। তাঁর লেখা সর্বত্রই স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন। সেইজন্যই তিনি নমস্য।

হরপ্রসাদ ছিলেন ভাবগম্ভীর লেখক। লঘু কৌতুকহাস্য তাঁর লেখায় বিশেষ একটা নজরে পড়ে না। কিন্তু মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। ব্যঙ্গ-কৌতুকের কশাঘাতে ইচ্ছে করলেই তিনি মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে পারতেন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় শাস্ত্রীমশায়ের 'তৈলদান' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ ছাপা হয়। সেই লেখাটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই আজকের হরপ্রসাদ-প্রণাম শেষ করি।

"তৈল সর্বশক্তিমান; যাহা বলের অসাধ্য. যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈলদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা। তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলীতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।। যে তৈল দিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্ণর হইতে পারে।"

১০৫ বছর আগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশায় এই কথাগুলি লিখেছিলেন। আমাদের মনে হয় মানবচরিত্র আজও সেই রকমই আছে, চিরকালই এই রকম থাকবে।

(১৯৮৭ সালে লিখিত)

সুব্রহ্মণ্য ভারতী—শতবর্ষের আলোকে

উনবিংশ শতকের শেষভাগ, মাদ্রাজ রাজ্যের এট্টায়াপুরম তালুকের মালিকেরা তখন রাজা বলে খ্যাত। এই রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সুতরাং জীবিকার উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছেই এলেন শিবালাপেরি গাঁয়ের চিন্নাস্বামী আইয়ার। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান। তামিল, ইংরেজি, গণিত এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। পশ্চিমী যন্ত্রবিদ্যায় তাঁর অপার কৌতূহল। যে কোন জটিল যন্ত্র কুট কুট করে খোলেন আবার টুক টুক করে জুড়ে নেন। রাজাদের নজরে পড়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে অজস্র পরিকল্পনা। একটা পরিকল্পনা রূপ নিল বাস্তবে, ১৮৮০ সালে এট্টায়াপুরমে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হল।

চিন্নাস্বামীর গৃহিণী হয়ে আসেন লক্ষ্মী। তাঁদের প্রথম সন্তান জন্ম নেয় ১৮৮২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। ছেলেটির নাম রাখা হয় সুব্রাহ্মণীয়ন। আদর করে ডাকা হয় সুব্বাইয়া। এট্টায়াপুরম সুব্বাইদের আত্মীয়স্বজনে ভরা। মাতামহ রামস্বামী আইয়ারও এখানেই থাকেন। সুব্বাইয়া বড় হচ্ছিল সুখে কিন্তু সুখ বেশিদিন থাকল না। পাঁচ বছর হতে না হতেই সে মাতৃহীন হল। মা লক্ষ্মী চলে গেলেন। এ দুঃখ জীবনেও যায়নি তাঁর। সুব্বাইয়া বড় হয়েও কেউ মা ডাকছে শুনলেই বেদনা বোধ করতেন।

মাতামহ এগিয়ে এলেন সুব্বাইয়ার লেখাপড়া সামলাতে। মাসি সীতা এলেন মায়ের জায়গায়। বিমাতা খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। আদর্শপ্রবণ ছেলে ও কর্মযোগী বাবার মধ্যে কতবার যে তিনি শান্তির সেতু রচনা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

খুব বুদ্ধিমান ছেলে সুব্বাইয়া। অকালপক্ক ই বলা যায়। তার কথাবার্তায় সকলে অবাক হয়ে যায়। আর যেমন তার বুদ্ধি তেমন তার বাঁদরামী। একবার একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। পিতার কটন মিলে যেত সে প্রায়ই তবে সদর দরজা দিয়ে নয়, দেয়াল টপকে। বাবা জেনেও কিছু বলতেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছেলেটার কৌতূহল জাগ্রত হোক, কর্মে মতি হোক। একদিন বিকালবেলা সমবয়সী কাকা সাম্বাশিবমকে নিয়ে গেছে সে কটন মিলে। বাবা নেই। সুতরাং বাবার চেয়ারে বসে তাঁর টেবিলের ড্রয়ার উলট পালট করার খেলাটা জমলো ভাল। পাওয়া গেল রিভলবারটা। এটা

কী, বাচ্চারা জানে না। সাম্বাশিবম টিপে টিপে পরীক্ষা করতে লাগলো জিনিসটাকে। হঠাৎ দুম করে বেরিয়ে গেল গুলি। সুব্বাইয়া বেঁচে যায় ইঞ্চিখানেকের জন্য। অবশ্য এতে তার দুষ্টুমী মোটেই কমল না। কিন্তু ছেলের পড়ায় মন নেই। পিতা যত কঠিনই হোন, শিক্ষক মশায়রা যত চেষ্টাই করুন, কোন লাভ হল না। সে কেবল কথায় কথায় কবিতা আওড়ায়। যে কোন শব্দ উচ্চারণ করলেই সেটা দিয়ে তৈরি হয়ে যায় কবিতা। কী করবেন এমন ছাত্র নিয়ে শিক্ষক মশায়রা? সুতরাং চারদিকের ভালবাসা কমতে থাকে। বালক মগ্ন হয়ে পড়ে কবিতার প্রেমে। পরে আত্মজীবনীতে কবি লিখেছেন ঃ

"বিহগ বিহগী যথা প্রেমে সুখে থাকে বনে,/অথবা দেবতা দেবী সাথে প্রেম গুঞ্জরণে,/পার্থিব সুখে নয় থাকে হর্ষোচ্ছ্বাসে;/তেমতি কেটেছে মোর স্বপ্নময় দিনমান/কল্পনা কাননে সদা কবিতা অমৃত কবি পান।"

(সুব্রহ্মণ্য ভারতীর তামিল কবিতার ইংরেজি অনুবাদ দেখে আমি চেষ্টা করেছি বাংলায় অনুবাদ করার। আমার অক্ষমতায় কবিতার শ্রী হয়ত বহুলাংশেই নষ্ট হয়েছে। সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।)

অন্যেরা নিরাশ হলেও মাতামহ কিন্তু দৌহিত্রের এই কবিতার মাদকতাকে হীন মনে করেননি। তিনি নিজে তাকে প্রাচীন তামিল কবিতা শেখাতে শুরু করেন। পরিচয় করিয়ে দেন প্রাচীন কাব্যশৈলীর সঙ্গে। বাবার চোখের আড়ালে গিয়ে মন্দিরের আনাচে কানাচে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতো সুব্বাইয়ার প্রাচীন তামিল কাব্য পাঠে। আট বছর বয়সে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে সে তাক লাগিয়ে দিত। কিন্তু লেখাপড়া শেখার জন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল তিরুনেলভেলীতে। কবির ভাষায় ঃ

"পিতার আদেশে গেলাম নেল্লাই/বিদেশী জ্ঞান করতে আহরণ;/সিংহ শিশুর হায় জুটল খাদ্য/শুষ্ক নিরামিষ তৃণ।"

তিন বছর ছিলেন সেখানে, তিনটি বছর একেবারেই নষ্ট হল বলা যাবে না। বন্ধু জোটে, জোটে প্রশংসাও। শুধু হলনা লেখাপড়া। একদিন ক্লাশের গ্যালারীতে সবচেয়ে পেছনে, উঁচু বেঞ্চে বসে আছে সুব্বাইয়া। পণ্ডিত মশাই বললেনঃ "শুনি তুমি নাকি কালো মেঘের বৃষ্টির মত কবিতা বল? কালো মেঘের মতই বসেছ গিয়ে সবার উপরে। তা কালো মেঘের মতই আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না কেন?" সুব্বাইয়া জবাব দেয় ঃ

"পণ্ডিত ঠাকুর করলেন ভুল/সোজা জিনিস গেল চোখ এড়িয়ে/আপন সুখে মেঘ দেয় জল/নিজে ইচ্ছায় পড়ে বেরিয়ে/পণ্ডিতের আদেশে তার/বাড়ে না জলের ভার/তখন আসে না বৃষ্টি ঝর-ঝরিয়ে।"

কিন্তু কবিতা বলতে পারলে কী হয়? ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার নির্বাচনী পরীক্ষায় পাশ করতে পারল না সুব্বাইয়া।-বাবার কত স্বপ্ন ছিল ছেলে হবে অধ্যাপক অথবা

জাঁদরেল কোন অফিসার। সব ভেস্তে গেল। কিন্তু ছেলে বাড়ি ফিরে এল। ছেলের মনে অবশ্য কোন দুঃখ নেই। সে যেন মুক্তি পেয়েছে।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত চাকরি জুটল জমিদারি সেরেস্তাতে। রাজাও ছেলেটিকে ভালবাসেন। প্রথমত, সে চিন্নাস্বামীর ছেলে, আর বিশেষত, সে তামিল ও ইংরেজিতে দক্ষ। কিন্তু রাজার প্রিয়পাত্র হওয়ার অর্থই হচ্ছে অনর্থক কিছু লোকের চক্ষুশূল হওয়া। তারা চেষ্টা করতে লাগল সুব্বাইয়াকে তাড়াতে। এদেরই একজন তাঁকে অপমান করল ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে। রাগে জ্বলে উঠল সুব্বাইয়া। বিদ্যার তর্কে আহ্বান জানাল অপমানকারীকে। বসল তর্কসভা। বিষয়ঃ শিক্ষা। রাজা নিজে বিচারক। রাজপণ্ডিত প্রথমে অপমানকারী সভাসদের পক্ষে বক্তব্য রাখার পর উঠে দাঁড়াল তরুণ সুব্বাইয়া। অসাধারণ বাগ্মিতা, সুতীব্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকে তাঁর বক্তব্য হয়ে উঠল অতুলনীয়। শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময়ে হতবাক। রাজসভার প্রবৃদ্ধতম পণ্ডিত উঠলেন, সুব্বাইয়াকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন, এবং তাঁকে 'ভারতী' বলে সম্বোধন করলেন। সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে তিনি সারা বিশ্বের কোটি কোটি তামিলভাষীর কাছে হয়ে উঠলেন, সুব্রহ্মণ্য ভারতী।

তখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন। রাজার অনুগ্রহ। পিতার ভাল অবস্থা। সুতরাং পনের বছরের ভারতীর সঙ্গে বিয়ে হল সাত বছরের চেল্লাম্মালের, মহাসমারোহে। বাল্যবিবাহ তো তখনকার দিনে সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু পরে ভারতী বুঝতে পেরেছিলেন যে বিয়ের শিকল পরার জন্য তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োগ করতে পারলেন না। কবির ভাষায় ঃ

"বুদ্ধি আমার অপক্ক তখনও/সেবাইত হলাম দু'জনার,/কর্তব্য সংসারের আর প্রেম আপনার।"

সময়ও হঠাৎ খারাপ পড়ল। কাপড়ের মিল ফেল পড়ল। বাবা মারা গেলেন। সন্তানদের নিয়ে বিমাতা চলে গেলেন বাপের বাড়িতে। ভারতীর বয়স তখনও কুড়ি হয়নি। পুরো সংসারের ভার পড়ল কাঁধে।

পিসী কুপ্পাম্মাল আর পিসেমশাই কৃষ্ণ শিবান থাকেন বারাণসীতে। সেখানে একটা ছোট্ট মঠে তাঁরা সেবাইত। কিন্তু সব খবরই রাখেন তাঁরা। চিঠি লিখলেন। চলে এসো এখানে। পড়াশোনা কর। একটা ডিগ্রী থাকলে ভাল চাকরি জুটে যায়। পত্র তো নয়, যেন আলোর দিশা। ভারতী চলে এলেন বারাণসীতে, ভর্তি হলেন সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে আর এন্ট্রাস পাশ করলেন প্রথম বিভাগে। প্রথম বিভাগটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে আগে তিনি টেস্ট পরীক্ষাই পাশ করতে পারেননি নেল্লাইতে। এবার বারাণসীতে হিন্দী ও সংস্কৃত দুটি নতুন ভাষা শিখে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়েছে।

পরীক্ষার পর কুড়ি টাকা মাস মাহিনায় শিক্ষকতা জুটল একটা। কঠোর দারিদ্র্যের

মধ্যে তাঁর একমাত্র নেশা কবিতা। শেলীর কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করেন আর ব্যাখ্যা করেন বন্ধুদের কাছে। নিজে গিয়ে প্রাণমন দিয়ে শোনেন সংস্কৃত কাব্যের ব্যাখ্যা।

এমন সময় জীবনে আবার মোড় ফিরল। মহারানী ভিক্টোরিয়া পরলোকগমন করেছেন। সপ্তম এডওয়ার্ড রাজা হয়েছেন। লর্ড কার্জন দিল্লীতে এক দরবার ডেকেছেন। এট্টায়াপুরমের রাজাও সেখানে গেলেন। ফেরার পথে তিনি এলেন বারাণসীতে। রাজার অনুরোধে কবি আবার ফিরে গেলেন এট্টায়াপুরমে। রাজার কবি সহচরের চাকরি। রাজার সভাসদদের দলাদলি আর আদিরসাত্মক কবিতার ক্রমবর্ধমান অনুরাগ দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছেড়ে দিলেন এ কাজ দু'বছরের মধ্যেই। ইতিমধ্যে তাঁর রপ্ত হয়ে গেছে রাজকীয় একটি কু-অভ্যাস—অহিফেন সেবন।

সর্বপ্রথম ১৯০৪ সালেই ভারতীর তামিল কবিতা 'নির্জনতা'—মাদুরাই-এর তামিল সাময়িকী 'বিবেকভানু'তে প্রকাশিত হল। ভারতী তখন দশ মাসের বদলী শিক্ষক। বেতন মাসিক সাড়ে সতেরো টাকা। এরপর তাঁকে দেখি মাদ্রাজে, 'স্বদেশ মিত্রম' দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে। প্রধান কাজ ভাল ভাল পত্রিকায় প্রকাশিত উঁচুদরের ইংরেজি প্রবন্ধের সুন্দর তামিল অনুবাদ। কাজটা খুব সোজা বলে মনে হবে আজ সকলের। কিন্তু আসলে তা নয়। চলিত তামিল তখনও তৈরি হয়নি। দেশে তখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক ডামাডোল। ইংরেজিকে সর্বজনগ্রাহ্য তামিলে অনুবাদ করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। এই সময়টাকে সুব্রহ্মণ্য ভারতীর শিক্ষানবিসির যুগ বলা যায়। প্রচণ্ড খাটুনী গেছে এই সময়ে। শুধু চলতি রাজনৈতিক প্রবন্ধই নয়, এই সময়ে তিনি অনুবাদ করেছেন বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের রচনা এবং কংগ্রেস সভাপতিদের বক্তৃতাও। এইসব অনুবাদের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে চলিত তামিল গদ্যের শৈলী। আধুনিক তামিল গদ্য ভারতীরই হাতে তৈরি।

'স্বদেশমিত্রম্' নরমপন্থী কাগজ, সুতরাং ভারতীর হাতে সম্পাদকীয় লেখার ক্ষমতা নেই। তিনি অন্য কাজ করতে লাগলেন। স্ত্রীজাতির সমান অধিকার আদায় ও জাতের বিভেদ তুলে দেওয়ার দাবীতে তাঁর কলম চলতে লাগলো নিরলস ভাবে। একটা কবিতা ছাপা হল 'স্বদেশমিত্রম্'-এ। নাম—'স্বাগত বাংলা'।

এই সময় ভারত জুড়ে চলছে রাজনৈতিক প্রস্তুতি। ভারতী মূলতঃ অনুবাদক, কত পত্রিকা তাঁকে পড়তে হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, রাসবিহারী ঘোষ, ফিরোজ শাহ মেহতা, লাজপত রায়, বিপিন পাল, বালগঙ্গাধর তিলক—এঁদের লেখা ও বক্তৃতা তিনি পড়েন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়। সারা দেশ জুড়ে আগুন জ্বলে ওঠে। সে বছর গোখলে কংগ্রেস সভাপতি; অধিবেশন বারাণসীতে। ভারতী *সেখানে এলেন রিপোর্টার হিসেবে। ১৯০৬ সালে সভাপতি হলেন দাদাভাই নৌরজী,* অধিবেশন কলকাতায়। ভারতী এলেন এখানেও। দেখা হলো ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। ভগিনী নিবেদিতাই হলেন তাঁর গুরু। নিবেদিতার তেজ দেখেই তিনি চরমপন্থী

রাজনীতিতে যোগ দেন। 'নিবেদিতা প্রশস্তি' কবিতাটি একটি অমূল্য রত্ন ঃ

"নিবেদিতা, মাতা/প্রেমের তুমি উৎসর্গিত মন্দির/হৃদয়ের তমিস্রা বিদূরণকারী সূর্য/জীবন মরুর তুমি বৃষ্টিধারা/অসহায়ের তুমি সহায়/পরমেশ্বরের তুমি অঞ্জলি/সত্যের তুমি স্ফুলিঙ্গ/তোমাকে নমস্কার।"

ভারতীর প্রথম কবিতার বই 'স্বদেশ গীতঙ্গল' উৎসর্গিত হল নিবেদিতার নামে। লেখা হলা, "শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, সেইরূপ আমাকে যিনি ভারতমাতা দর্শন করান, আমার হৃদয়ে যিনি স্বাদেশিকতার বীজ উপ্ত করেন, আমার সেই গুরুর চরণে অর্পণ করলাম এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ।" এক বছর পর আবার নিবেদিতার নামে উৎসর্গিত হল 'জন্মভূমি' নামে আরেকটি গ্রন্থ।

কলকাতা থেকে ফিরে গেলেন মাদ্রাজে। ভারতী এখন একেবারে অন্য মানুষ। 'স্বদেশমিত্রম্' এর মত নরম কাগজে আর চলে না। জুটে গেল আরেক ভাবের পাগল। মাণ্ডায়াম থিরুমালা চেরিয়ার নামে এক ধনী স্বদেশপ্রেমী ব্রাহ্মণ তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে গড়ে তুললেন 'ইন্ডিয়া' নামে একটি তামিল পত্রিকা। ভারতীর কলম দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল ইন্ডিয়ার পাতায় পাতায়। একটা ইংরেজি সাপ্তাহিকও সম্পাদনা করতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে—'বাল ভারত'। স্বদেশী ব্যবহার ও বিদেশী বর্জন করানোর জন্য তাঁরা 'ভারত ভাণ্ডার' নামে একটি বিপণনীও গড়ে তুললেন।

এ সময়ে একটা মজার কাণ্ড ঘটে। ভারতী ও তাঁর বন্ধুরা অনেক চেষ্টায় বিপিনচন্দ্র পালকে নিয়ে যান মাদ্রাজে বক্তৃতা দিতে। পালমশায় খ্যাতনামা চরমপন্থী। তাঁর সভায় সভাপতিত্ব করার লোক পাওয়া যায় না মাদ্রাজে। অনেক কষ্টে একজনকে যোগাড় করে কোন মতে কাজ চালানো হয়। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতায় মাদ্রাজে স্বাদেশিকতার জোয়ার আসে। শুরু হয় বিদেশী পণ্যের বহ্ন্যুৎসব। তখন থেকেই সুব্রহ্মণ্য ভারতী সুস্পষ্ট চরমপন্থী কংগ্রেসী। তিলকের নামে লিখিত কবিতায় ভারতী লিখলেন ঃ

"তিনি একটি শক্ত দুর্গ গড়েছেন 'শিক্ষা' নাম তার/চার পাশে তার পরিখা কেটেছেন/স্রোতস্বিনী চিন্তার,/তিনি একটি মন্দিরও গড়েছেন/'স্পষ্টবাক্য' নাম তার,/তার উপরে তুলেছেন তিনি পতাকা স্বাধীনতার।"

ভারতীর পত্রিকায় একদিকে চরম পন্থীরা পাচ্ছেন প্রশংসা, অন্যদিকে নরমপন্থীরা পাচ্ছেন তীব্র বিদ্রূপ। যে দুজন বিদ্রূপ তাঁর সব চেয়ে বেশী সহ্য করেছেন তাঁরা হলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে আর ভি. কৃষ্ণস্বামী আইয়ার।

সুব্রহ্মণ্য ভারতী ঠিক করলেন স্বদেশী কবিতার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করবেন। বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। কিন্তু একটি কবিতাও পাওয়া গেল না। নিজেই লিখতে থাকলেন কবিতা। কিন্তু ছাপবেন কেমন করে? পয়সা কোথায়? বন্ধু নটেশন বললেন, এসব ব্যাপারে কৃষ্ণস্বামী আইয়ারের সাহায্য আশা করা যায়। আইয়ার? যাঁর নামে

এত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন ভারতী তিনি করবেন সাহায্য! কিন্তু নটেশন নাছোড়বান্দা। একদিন ভারতীকে নিয়ে গেলেন আইয়ারের বাড়ি। আইয়ার শুনলেন কবিতা ঃ

"হাজার জাতের ব্যাঙের ছাতা যতই এদেশে উঠুক/পরদেশীর জায়গা এখানে হবে না;/মায়ের ছেলেরা যতই কোন্দলে নামুক/ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কখনও টুটবে না।"

আইয়ার কিন্তু ভারতীকে চেনেন না। তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন কবিতার। সসঙ্কোচে নটেশন বললেন কবির নাম সুব্রহ্মণ্য ভারতী। যে 'ইন্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক। কৃষ্ণস্বামী আইয়ার মহাকৌতুকে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমিই সুব্রহ্মণ্য ভারতী! তাহলে তুমি দেশকে সত্যি ভালবাস? আমি ভাবতাম ওটা কোন পাগল। আইয়ারের অর্থানুকূল্যে ভারতীর স্বদেশী কবিতার একটি সংকলন ১৫০০ কপি মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হয়। একটি কবিতার অংশ ঃ

"এই দেশেরই মায়েরা মোদের যুবতী সব মেয়ে/পতিগৃহে গেছে গড়ে তুলেছে নিজের ঘর যেয়ে/এই সে দেশে পেয়েছে তাঁরা আনন্দ পরম/বাসনা সুপ্ত সন্তানে উপ্ত নারীর প্রাপ্তি চরম।/দেশের সর্বত্র মন্দির গাত্র শিখায়েছে এই বাণী সবে/পরম গুহ্য আসল তথ্য সত্য ও শিবে। তাঁরা গেছে চলে সন্তানের দলে নিয়েছে দায়িত্বভার/প্রতি দেবদেবী পেয়েছে সবই আপন পূজা উপচার।/সেই দেশের পূজা করেছি ধরম/সেই দেশের সেবা কর্তব্য পরম/গাই বন্দে মাতরম্।"

১৯০৮ সালে ভারত জুড়ে আরম্ভ হল চরম দমন ও পীড়ন। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় দ্বীপান্তরে গেলেন। মহারাষ্ট্রে তিলক গণেশ ও শিবাজী উৎসব করলেন। বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর বোমা মামলায় আসামী হলেন। এমতাবস্থায় 'ইন্ডিয়ার' সম্পাদকের উপর যে ব্রিটিশের সুনজর যে কোন সময়েই পড়বে তা ভারতী নিজেও জানেন: আর হলও তাই। পুলিশ এল, হাতে ওয়ারেন্ট। ভারতী তখন বেরুচ্ছিলেন। বললেন, 'সম্পাদকের নামে ওয়ারেন্ট? দেখুন ভেতরে। আমি সম্পাদক নই। কথাগুলি সত্য। কাগজে কলমে 'ইন্ডিয়া'র সম্পাদক এস-শ্রীনিবাসন। বেচারা গ্রেপ্তার হল কিন্তু বন্ধুরা ধরে বসল ভারতীকে, 'তুমি আজই পালাও।' তিনি যাবেন না। বড় বড় নেতারা জেলে আর তিনি কাপুরুষের মত অত্যাচারের ভয়ে স্বাস্থ্যের অজুহাতে পালিয়ে গেলে ইতিহাস তাঁকে ক্ষমা করবে না। বন্ধুরাও ছাড়বে না! ভারতী জেলে গেলে তাঁর কলম স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাতে যে অপরিসীম ক্ষতি হবে তার জন্য তিনি ক্ষমা পাবেন কোথায়? অগত্যা তিনি চলে গেলেন পণ্ডিচেরী। প্রথম স্বেচ্ছানির্বাসিত স্বদেশী যোদ্ধা।

চরম দারিদ্র্য, ফেউ-এর মত ডজন ডজন ব্রিটিশ গুপ্ত পুলিশের সব সময় ঘুর ঘুর করা সত্ত্বেও 'ইন্ডিয়া'র পুরো ছাপাখানাটাই চলে এলো পণ্ডিচেরী। শুরু হল 'ইন্ডিয়া' আবার। শুরু হল 'বাল ভারত' এবং ব্যঙ্গচিত্র পত্রিকা 'চিত্রাবলী'। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তির প্রয়োগে একে একে সব ক'টাই বন্ধ হয়ে গেল ১৯১০ সালে।

ভারতীর প্রতিভায় চরম আঘাত এল। নিষ্কর্ম জীবন তখন তাঁকে পাগল করে তুলত। কিন্তু এই সময়ে আলিপুর মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে অরবিন্দও চলে এসেছেন পণ্ডিচেরী। আর তিনি এখন অন্য মানুষ। তিনি ঋষি। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য তাঁকে বিশ্বাস করে না। তারা শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত মাসিক পত্র 'আর্য্য'কে উলটে পালটে শুঁকে দেখছে রাজদ্রোহের গন্ধ আবিষ্কার করা যায় কিনা। এই সময়ে পণ্ডিচেরীতে আরও একজন 'ভয়ঙ্কর' স্বদেশী এসেছেন, ভি. ভি. এস. আইয়ার। অরবিন্দ, আইয়ার ও ভারতী তিন জনেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত। সঙ্গে জুটলেন একজন বিমুগ্ধ শ্রোতা। শ্রীনিবাস আচারিয়া। পণ্ডিচেরীর সমুদ্রবেলায় বসে এই চার জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন দিনের পর দিন।

সুতরাং দেশপ্রেম ও ভগবৎপ্রেম দুইই চলতে লাগল পাশাপাশি। সময় কাটাবার আরেকটি জায়গা হল হরিজনদের দেবমন্দির মুথুমারী। এই মন্দিরের বিগ্রহের প্রার্থনা স্তোত্র লিখলেন ভারতী ঃ

"অন্তরেই যারা হীন ও দীন/তারা সততই মরে দুঃখে/আমি স্বেচ্ছায় তোমার সেবায় লীন/তোমার মাহাত্ম্য আমায় করে রক্ষে/সুমধুর তামিল স্তোত্রে গাহি/মহা মাহাত্ম্য দেবী শক্তির/আর কোন ভয় নাহি/জ্বেলেছি প্রদীপ ভক্তির/সর্ব বেদে আছে ঘোষণা/শক্তিই আদি কারণ/মোদেরও একমাত্র এষণা/তোমার সেবার কর্ম করণ।"

আর চলে সাধু সঙ্গ। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতে যতই সন্ত্রাসমূলক কাজ বাড়তে লাগল ততই পণ্ডিচেরীতেও গুপ্ত পুলিশের উৎপাত বাড়তে লাগল। কত রকম ছদ্মবেশে যে তারা আসে তার আর ইয়ত্তা নেই। আর সহ্য হয় না। এর মধ্যেও ভারতী লিখলেন সেই সাহসিক কবিতা—জয়ম উণ্ডু।

"হৃদয় নির্ভয় হও বিজয় নিশ্চিত/স্বাধীনতার আমাদের/সুদিন আগত/পরমা মাতৃদেবী মোর হৃদয়ে বসে/ভক্তির ফল আনবে অমৃত রসে/মস্তক উন্নত সু-উচ্চ গিরিসম/বহে মাতৃকার ঐ হিরণ্ময় চরণ/মাতৃকার অঞ্জলি চিন্তাভার কার্যও/আছে ধর্ম; আছে সঙ্গে শক্তিও।

কত কবিতাই লেখা হয়েছে এই সময়ে। মনকে ছেড়ে দিয়েছেন বল্গাহীনভাবে—

"সমীরণ, চন্দ্রালোক আর তারাগণ/স্থাপিয়া সম্মুখভাগে/মধু হেন কল্পনা সুধা করি পান/কাব্যের উদ্বেলতা জাগে/অণুকণা হেন বস্তু যার নাম/খুলে দিলাম তারে বল্গাহীন/হারে অন্ধ কেন ধন্দ দেখিলে যখন/গীতরত অলি কেন ফলে উদাসীন/যাও বন্ধু মন, এখানে তোমারে না সাজে/আকাশেতে বস গিয়ে তারাদের মাঝে।"

১৯১২ সালটা তাঁর অবিশ্রাম কাব্যচর্চায় কেটেছে। তাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠ তিনটি কাজ এই বছরেই হয়েছে। কন্নন পট্টু নামে ভক্তিগীতাবলি, গীতার অনুবাদ এবং পাঞ্চালী সপ্তম। গীতার অনুবাদ করার সময় তাঁর ক্রমাগত কৃষ্ণ দর্শন হতে থাকে।

প্রেমিক, সখা, স্ত্রী, শিশু, মাতা, সেবক ও ভ্রাতা এই সপ্তভাবে তিনি কৃষ্ণ দর্শন লাভ করেন। এগুলিই পাঞ্চালী সপ্তম-এর বিষয়বস্তু। এরপর লেখা হয় কুরিল পাট্টু। অনেকটা কোল্‌রিজ এর 'কুব্‌লা খানে'র মত রচনা এটি।

শিশুর সারল্য, অসাধারণ স্বদেশপ্রেম, অতুলনীয় ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অচিন্তনীয় সংসার অনভিজ্ঞতা। খাবার জোটে না। স্ত্রী কেমন করে জানি এক মুঠো চাল জোগাড় করে এনেছেন। ঘরে রেখে অন্য ঘরে গেছেন। ফিরে এসে দেখেন ঘরময় চাল ছড়ানো। মহানন্দে চড়ুইরা তা খাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগে চোখ ফেটে জল এলো চেল্লাম্মার। কবি নির্বিকার চিত্তে গাইছেন—

"সকল শৃঙ্খল পার হয়ে যাও/স্বাধীনতায় আনন্দ করো/চড়ুই পাখির মত কুটে কুটে খাও/কল কল শব্দে গান ধরো। সাঁতরে বেড়াও ঘূর্ণি বাতাসে/অসীম মুক্তিতে ঘুরে বেড়াও/আলোর বন্যা ঐ সুনীল আকাশে/অনন্ত আলোক পিয়ে নাও। কিচির মিচির কি আনন্দ, কি সুন্দর প্রেম,/নির্মিছে নীড় ঐ বিপদ থেকে দূরে/বাঁচাচ্ছে শাবক, ফোটাচ্ছে ডিম,/করছে লালন স্নেহে খাদ্যকণামুখে পুরে।/যে ক'টা চাল পড়ে আছে খেয়ে যাও/যাও উঠোনে, কাটা-শস্য মাঠে যাও/গল্প কর, কর গান, বিশ্রাম নাও/ভোরে উঠে আবার গান ধরে দাও।

প্রচণ্ড অর্থ কষ্টে দিন কাটে। অসুস্থ সন্তানের জন্য ডাক্তার ডাকার পয়সা নেই। সুতরাং ঠিক করলেন ব্রিটিশ ভারতেই চলে আসবেন। এই কষ্টের চেয়ে কারাবাস কিছু খারাপ নয়। ১৯১৫ সালেব সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর ডাইরীটা পাওয়া গেছে। ভারতী তখন ভক্ত কবি। কিন্তু অর্থ পাওয়ার কোন প্রার্থনা নেই ভগবানের কাছে। চাইছেন শুধু স্বাধীনতা।

পরাশক্তির কাছে কেবল সেই প্রার্থনা। 'মুমূর্ষু ভারত ও পুনরুত্থিত ভারত' কবিতায় লিখলেন ঃ

"তুমি দুর্বল, পুতুল মানুষ, দূর হও/তুমি ভীরু, দুরু দুরু বুক, দূর হও,/তুমি মৃত, ভাবলেশহীন মুখ, দূর হও,/তুমি শঙ্কিত, নিষ্প্রভ চোখ, দূর হও। এসো এসো তুমি ইস্পাত বুক/এসো এসো তুমি সুমধুর বাণী/এসো এসো তুমি বীর সেনানী।/এসো এসো নিয়ে স্ফটিক-স্বচ্ছ মন/এসো করো নীচতা শোধন/এসো এসো দাও দুর্বলে বল/এসো লয়ে সিংহ সবল। "

শেষ পর্যন্ত তিনি চলে গেলেন মাদ্রাজে। তাঁর নামে অনেক পরওয়ানা ঝুলছে। তাঁকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হলো। অনেক বড় বড় লোকের চেষ্টায় তিনি অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তি পেলেন। তখন চলে গেলেন গ্রামে বাস করতে অসুস্থ শরীরকে চাঙ্গা করে তুলতে। কিন্তু বেশীদিন শান্তিতে থাকতে পারলেন না। নিবেদিতার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জাতিভেদ মানবেন না। তিনি মানেন না। তাঁর বাড়িতে

অনেক লোক আসে। এদের বেশির ভাগই তথাকথিত অস্পৃশ্য, ছোটলোক। এমন কি মুসলমান পর্যন্ত আসে এই ব্রাহ্মণ পাড়ায়। শুধু কী তাই? সেদিন পাগলা আদর করে ঘাস খাওয়াচ্ছিল, জড়িয়ে ধরছিল, একটা গাধাকে। একে বিদায় কর। ভারতী বিদায় হলেন। চলে গেলেন গ্রামের বাইরে।

প্রায়ই মাদ্রাজে যান। এদিকে সেদিকে বক্তৃতা করেন। অধিকাংশই ধর্মীয় বক্তৃতা। পুরানো সেই 'স্বদেশমিত্রম'এ আবার কাজ জুটল। সহকারী সম্পাদকের উঁচু পদ। সম্পাদকের মাসিক বেতন এক হাজার টাকা সহকারী সম্পাদকের এক শ'। রাজনৈতিক লেখা লেখেন। মনে চিন্তা সমস্ত লেখা প্রকাশ করার। চল্লিশ খণ্ডে তাঁর সমস্ত লেখা প্রকাশ করার কথা বিজ্ঞাপিত হল। তিনি যখন আর এই পৃথিবীতে থাকবেন না তখন তাঁর লেখা কেনার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, তাঁর লেখা আধুনিক তামিল জাতীয়তাবাদের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াবে, তাঁর লেখা বাড়িতে না থাকলে বাড়ি সাজানো অপূর্ণ থাকবে, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য বিশ্বজুড়ে তামিলভাষীদের মধ্যে সাজ সাজ রব উঠবে, তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জীবৎকালে তাঁর লেখা কেনার জন্য অগ্রিম চাঁদা দিতে একজন তামিলভাষীও এগিয়ে এলেন না। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে ঃ

> Seven Grecian cities fought for Homer dead.
> Through which the living Homer begged for bread.

এই সময় একবার গান্ধীজীর সঙ্গেও দেখা হল। কথাও হল কয়েকটা। কিন্তু কেউ পরিচয় করিয়ে দিল না ভারতীকে গান্ধীজীর সঙ্গে।

চড়ুই পাখি, অস্পৃশ্য মানুষ, মুক পশু, নিষ্পাপ মানব শিশু, সকলের জন্য সমান প্রেম, সমান ভালবাসা। গাধাকে আদর করেছিলেন বলে গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তিনি চিড়িয়াখানায় গিয়ে হাত বাড়িয়ে আদর করতে যান সিংহকে। বলেন, পশুরাজ, আমি কবিরাজ এসেছি, একবার গর্জন করে সম্ভাষণ করো তো? কী আশ্চর্য, সত্যি সত্যি সিংহ গর্জন করে ওঠে! শিশুর মত খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠেন ভারতী। এক বিকালে গেলেন পার্থসারথির মন্দিরে। মন্দিরের হাতিকে উপহার দিলেন নারকেল ও অন্যান্য ফল। হাতিটির মেজাজ সেদিন বিশেষ ভাল ছিল না। শুঁড় দিয়ে দিল এক আঘাত। অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন ভারতী হাতির পায়ের কাছে। কেউ সাহস করছে না কাছে যেতে, হাতির পায়ের কাছ থেকে অচৈতন্য কবিকে নিয়ে এসে তাঁর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতে। খবর পেলেন বন্ধু কুবালাই কান্নান। নিজের জীবন তুচ্ছ করে অচেতন ভারতীকে তুলে আনলেন তিনি। চিকিৎসায় সেরে উঠলেন ভারতী। কিন্তু শরীর বড় দুর্বল। আছে পেটের পীড়া। ১৯২১ এর ১২-সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তামিল ভাষার শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি, সবচেয়ে লোকপ্রিয় কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে লোক এসেছিলেন জনা পঁচিশেক। শোকবার্তা বেরিয়েছিল গোটা দুই তিন কাগজে। তাঁর মৃত্যুর পর কিছুদিন তাঁর পরিবার অবর্ণনীয় অর্থকষ্টে কাটিয়েছে। ধীরে ধীরে বই বিক্রী থেকে কিছু কিছু টাকা এসেছে। ত্রিশের দশকে কবির ভাই বিশ্বনাথ আইয়ার কবির নির্বাচিত রচনাবলী প্রকাশ করেন—'ভারতী প্রচুরালয়ম্'। ক্রমে ভারতীর স্বদেশগীতি ঘরে ঘরে প্রচারিত হতে থাকে। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র রচনাবলী মাত্র ৭৫ টাকায় দিয়ে বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তার অনেক আগে, পঞ্চাশের দশকেই মাদ্রাজ সরকার ভারতীর রচনাবলী বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। এর পরে সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন প্রকাশক। এখন তো সুব্রহ্মণ্য ভারতীর কথা মুখে মুখে।

(ত্রিপুরা রবীন্দ্র-পরিষদ এর মুখপত্র 'ভাস্কর'-এর ১৯৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানুষের বাকপ্রত্যঙ্গ অসংখ্য ধ্বনি প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু যে-কোনো ভাষা বলার জন্য সীমিত সংখ্যক ধ্বনি প্রয়োগ করা হয়। পৃথিবীর মানুষ অনেক ভাষায় কথা বলে। এই সব ভাষা লিখবার জন্য বহু রকমের লিপিও প্রচলিত আছে কিন্তু লিপির সংখ্যা কমানোর প্রচেষ্টাও চলছে। জাপানের ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ ওনিশির সম্মানে ১৯৭৪ সালে *The Phonetic Association of Japan* দ্বারা *World Papers in Phonetics* নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। ঐ লেখায় সুনীতিকুমার মানুষের ভাষাসমূহের দ্বারা ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন—

"এই সংখ্যা মাত্র তেরো কি পনেরো থেকে, যেমন দেখা যায় হাওয়াইয়ান-এর মত পলিনেশিয়ান ভাষাগুলিতে, ... পঞ্চাশ পর্যন্ত হতে পারে, যেমন দেখতে পাই বান্টু নিগ্রো অথবা বুশম্যান হটেনটট্-দের ভাষায় .... (হিন্দুস্থানীতে এই সংখ্যা পঁয়তাল্লিশের মত)।

এই উদ্ধৃতিটিতে অনেক অলিখিত কথা আছে আচার্য সুনীতিকুমার সম্পর্কে। প্রথমত দূর প্রাচ্যের জাপানী ধ্বনিবিজ্ঞান পরিষদ জাপানের একজন ধ্বনিবিজ্ঞানী ডঃ ওনিশির সম্মানে প্রকাশিতব্য স্মারক গ্রন্থে লেখা পাঠানোর জন্য তাঁর কাছে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছিলেন। তিনিও লেখা পাঠিয়েছিলেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের ভাষাসমূহের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি বলেছেন আফ্রিকার অরণ্যবাসী বান্টু নিগ্রোদের ভাষার কথা এবং বুশম্যান হটেনটটদের ভাষার কথা। কত ভাষার কথা জানতেন তিনি? ইংরেজি, রুশ, স্পেনীশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে তিনি সেই সেই ভাষাতেই কথা বলতেন। আধুনিক ভারতের বড় বড় ভাষাগুলিতে তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ। সংস্কৃতে তিনি ছিলেন একজন মান্য পণ্ডিত। ভাষাতত্ত্বের বিচিত্র জগতে তার অবস্থান ছিল বিশ্ববরেণ্য। পৃথিবীর সর্বত্র ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর উপস্থিতি, ভাষা ও লিপি সমস্যায় তাঁর মতামত ছিল অপরিহার্য। বেশিরভাগ মানুষের কাছে তিনি

ভাষাতত্ত্বের আচার্য হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। *Origin and Development of the Bengali Language* নামক গ্রন্থের তিনি প্রণেতা এবং ভারতে এই ধরনের গবেষণার তিনি পথিকৃৎ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শেষে জাতীয় অধ্যাপক।

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও শ্যাম সফরে যান। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রী' নামক বইটিতে লিখেছেন—"আমাদের দলে আছেন সুনীতি। আমি তাকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোত বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল ভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজ-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছু নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না।"

তুচ্ছ যে কত সুন্দর ও স্মরণীয় হতে পারে তার একটি বর্ণনা পাই সুনীতিকুমারের লেখায়। তিনি গিয়েছিলেন একটা চৈনিক সংবাদপত্রের অফিসে। সেখানে একটা জিনিস দেখে তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন। একটা বিশাল ঘরের মধ্যে একদল লোক ছোটাছুটি করছে। জিজ্ঞেস করে জেনে আরো বেশি তাজ্জব হলেন। ঐ ঘরে ছাপার বিষয় কম্পোজ করা হচ্ছে। যারাই ছোট ছাপাখানা দেখেছেন, তারাই দেখেছেন যে কম্পোজিটার একটা খোপ কাটা বাক্সের সামনে বসে খোপ থেকে অক্ষর তুলে সাজান। এরই নাম কম্পোজ করা। ইংরেজিতে যদি অক্ষরের সংখ্যা সত্তরটি হয়, বাংলায়ও প্রায় তেমনি। কিছু বেশি। চৈনিক ভাষায় অক্ষরের সংখ্যা যদি ত্রিশ হাজার হয়? তা হলে বিশাল ঘরের চারপাশের দেয়াল জুড়ে খোপ থাকে এবং কম্পোজিটার সারাক্ষণ দৌড়ে কম্পোজ করার অক্ষর তুলেন ও সাজান। সুনীতিকুমার এটি দেখেছেন এবং তাঁর কলমে এই তুচ্ছ বিষয়টিও এমন সুন্দর হয়ে চিত্রিত হয়েছে।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন সুনীতিকুমার। কত বড় পণ্ডিত ছিলেন তিনি? সুকুমার সেন বলেন—"তাঁর পাণ্ডিত্যের অবধি তাঁর জ্ঞানের সীমানা রীতিমতো মাপজোখ করবার বিষয়। সে কাজে অধিকার কার বেশি আছে তা জানি না। তবে এই মাত্র যে মাপজোখ করা হলো তা বোঝবার লোক বোধ হয় এদেশে নেই।" লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক মিচেল একবার বলেছিলেন *"I can't understand why Indians should come over to England to learn Linguistics. Their country produced Panini and today Dr. Chatterjee is their countryman."* এই প্রবন্ধের লেখক হায়দ্রাবাদের *Central Institute of English and*